বড়দের বয়ান

ঈমান-আমল সুরক্ষিত রাখতে হক্কানী উলামায়ে কেরামের সঙ্গে থাকুন, অন্যদের সঙ্গ ছাড়ুন

শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দা.বা.

২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ঈসাব্দে জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ায় দাওয়াতুল হকের আইম্মায়ে মাসাজিদের মাসিক জলসায় প্রদত্ত বয়ান

হামদ ও সালাতের পর...

قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا.

মুহতারাম হাযেরীন! বর্তমানে আমরা একটা কঠিন সময় পার করছি। নতুন নতুন ফেরকা মুসলমানদের দীন ও ঈমান ধ্বংস করে দিচ্ছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাবাণী করেছেন, একটা সময় আসবে, যখন মানুষ সকালে মুমিন থাকবে, বিকেলে কাফের হয়ে যাবে। আবার বিকেলে মুমিন থাকবে, সকালে কাফের হয়ে যাবে। সে সময়টি যে কতটা জটিল ও কঠিন হবে, এই হাদীস দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায়। ওই যামানা সম্পর্কে নবীজী আরও বলেছেন, মানুষ অল্প কিছু পয়সার বিনিময়ে নিজের দীন ও ঈমান বিকিয়ে দিবে। তো সেই যামানা এখন আমাদের সামনে এসে গেছে। আজ হাজারো মানুষ এমনকি নামধারী অনেক আলেম-উলামাও দু'-চারটি পয়সার জন্য বাতিলের দলে যোগ দিচ্ছে। এরা হয়তো ভালো করেই জানে যে, ওটা গোমরাহ ফেরকা, ওদের কথাবার্তা ইসলাম বিরোধী এবং ওদের অবস্থান সহীহ ঈমান-আকীদার বিরুদ্ধে, তথাপি এসব আলেম বাতিলের অন্যায় তরফদারি করে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে, বাতিলের গোমরাহী কর্মকাণ্ডে সমর্থন দিচ্ছে, এমনকি বাতিলের গোমরাহী কথাবার্তার পক্ষে দলীল সরবরাহ করছে! এই কঠিন মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা যে আমাদেরকে হক্কানী উলামায়ে কেরামের সোহবতে এসে সুন্নাতের প্রচার-প্রসারের কাজে জুড়ে থাকার তাওফীক দান করেছেন, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আমাদের প্রতি অনেক বড় ইহসান ও অনুগ্রহ। সারা জীবন সিজদায় পড়ে থেকেও আমরা এই অনুগ্রহের শোকর আদায় করে শেষ করতে পারব না। আজ শত শত লোক দীনের নামে গোমরাহ হচ্ছে। তাদের দাবি হল, তারা দীনের কাজ করছে, অথচ তাদের অন্তর উলামায়ে কেরামের বিদ্বেষে ভরপুর। উলামায়ে কেরামের বিপক্ষে তারা সারাদিন মিথ্যা বলছে, ওয়েবসাইট খুলে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করছে এবং উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে এমন এমন জঘন্য মন্তব্য করছে, যেগুলোর কারণে মন্তব্যকারীর ঈমান থাকে না। উলামায়ে কেরামকে আমরা মামুলি মনে না করি, তারা মামুলি কেউ নন। উলামায়ে কেরাম তো রাসূলের স্থলাভিষিক্ত। তারা তো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থলাভিষিক্ত হয়ে তারই কাজ করে যাচ্ছেন। সুতরাং তাদের না-হক বিরুদ্ধাচরণ করে ঈমান ধরে রাখা যায় না, ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।

কেউ যদি বলে, এখন থেকে আর হাসপাতাল চালাতে ডাক্তারের প্রয়োজন নেই; আমরা রোগীরাই হাসপাতাল চালাবো। তাহলে বুঝুন, সেই হাসপাতাল কেমন চলবে!? যে হাসপাতাল থেকে ডাক্তারদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হয় যে, ডাক্তাররা উল্টাপাল্টা চিকিৎসা করে, কাজেই তাদের দরকার নেই; আমরা রোগীরা কি কম বুঝি? আমরাই চালাবো! তাহলে এমন হাসপাতাল দ্বারা কবরস্থান আবাদ করা ছাড়া জনগণের আর কী ফায়দা হবে? এমন হাসপাতালে রোগীরা দলে দলে মরতে থাকবে, আর বেশি বেশি কবরস্থান আবাদ হবে। কারণ, সেখানে ডাক্তার নেই।

বর্তমানে সহীহ তরীকায় দীনের যত লাইনে যত রকম মেহনত চলছে, সেগুলো রূহানী হাসপাতাল। এই যে আপনারা দীনের কথা শোনার জন্য এই মজলিসে উপস্থিত হয়েছেন, এটা রূহানী হাসপাতাল। অনুরূপভাবে যেসব ওয়াজ মাহফিলে হক্কানী উলামায়ে কেরাম বয়ান করেন সেগুলোও রূহানী হাসপাতাল। দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতও রূহানী হাসপাতাল। অনুরূপভাবে খানকা, যেখানে আত্মশুদ্ধি করা হয়, অন্তরের রোগসমূহের চিকিৎসা প্রদান করা হয় সেটাও রূহানী হাসপাতাল। বলাবাহুল্য এসব রূহানী হাসপাতালের চিকিৎসক হলেন হক্কানী উলামায়ে কেরাম। চিকিৎসা এরাই দিবেন, রূহানী চিকিৎসা উলামায়ে কেরামই দিবেন। এখন যদি বলা হয়, উলামায়ে কেরামের দরকার নেই, এদেরকে সরিয়ে দাও, আমরা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়াররাই রূহানী হাসপাতাল চালাবো, তাহলে সেই হাসপাতালের ধ্বংস অনিবার্য। ওখান থেকে কেউ আর রূহানী খোরাক পাবে না। ফলে দলে দলে রূহ ও আত্মার মৃত্যু ঘটবে। আজকাল এগুলোই চলছে। কেউ কেউ মন্তব্য করছে, উলামায়ে কেরাম হলেন ছাগল, এরা কিচ্ছু বোঝে না, এদেরকে ঘাস-পাতা খেতে দাও। নাউযুবিল্লাহ। এই মন্তব্যের কারণে যে তার ঈমানটাই নষ্ট হয়ে গেল, এই সাধারণ জ্ঞানটুকুও তার নেই। এই হল কিছু লোকের দীনের নামে মেহনতের হাল-হাকীকত। দীনের মেহনতের দাবীদার হয়েও এরা এসব জঘন্য মন্তব্য করছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্যজনক। যেখানে দারুল উলূম দেওবন্দ স্পষ্ট বলে দিয়েছে যে, এরা একটা বাতিল ফেরকা দাঁড় করাচ্ছে। মনে রাখতে হবে, দেওবন্দ কোন সাধারণ মাদরাসা নয়। দেওবন্দ আজ সারা দুনিয়ার মাদরাসাসমূহের হেডকোয়ার্টার। দেওবন্দ তো সারা দুনিয়ার মুসলমানদেরকে হেদায়াতের পথ দেখাচ্ছে। দেওবন্দের দায়িত্বশীলগণ গভীর চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা ছাড়া মন্তব্য করতে পারেন না। তারা অনেক ভেবেচিন্তে, দূরদর্শিতার সাথেই মন্তব্য

করে থাকেন। তো দেওবন্দ মন্তব্য করেছে যে, 'মাওলানা সাদ সাহেব একটি নতুন মতবাদ সৃষ্টি করছেন। সাদ সাহেব ও তার অনুসারী এতায়াতকারীরা যেভাবে চলছে, এভাবে চলতে থাকলে তারা আহলে সুন্নাহ ওয়াল-জামা'আত থেকে খারেজ হয়ে যাবেন। তারা আমাদের পূর্বসূরী আকাবেরদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবেন।' তো কোন দলের বিরুদ্ধে দারুল উলূম দেওবন্দ যদি এমন মন্তব্য করে এবং এরপরও যদি কিছু সুবিধাভোগী আলেম এই ভ্রান্তদলের সমর্থন করে, তাদের পক্ষে কাজ করে তাহলে সুস্পষ্ট যে, তারা নিছক দুনিয়াবী কিছু স্বার্থ হাসিলের জন্যই এটা করছেন। তাদের এ কাজের অন্য কোন ব্যাখ্যা আমার বুঝে আসে না। যেখানে হকের কিছুই নেই, সব কুরআন-সুন্নাহর মনগড়া ব্যাখা; অনুরূপভাবে হিন্দুদের নিরাপত্তাবেষ্টনীতে থেকে নিজেকে আমিরুল মুমিনীন ঘোষণা করা, নিজস্ব সেনাবাহিনী ছাড়াই নিজেকে সারাবিশ্বের মুসলমানদের আমীরুল মুমিনীন বা খলীফা দাবী করা–এসব কি ঐসব আলেমদের চোখে পড়ে না!?

আজ যেদিকে তাকাই, গোমরাহীর সয়লাব। বড় বড় মাহফিল করা হচ্ছে, আর আয়োজকদের পক্ষ হতে ক্যামেরার ব্যবস্থা করে পুরো মাহফিলের ভিডিও করা হচ্ছে। অথচ এগুলো ছিল হেদায়াতের মাহফিল। হেদায়াতের মাহফিলেই যদি ছবি তোলা হয়, ভিডিও করা হয়, তো সেই মাহফিল দ্বারা কী হেদায়াত আসবে? সেই মাহফিল দ্বারা লোকজনকে গোমরাহ করা ছাড়া আর কিছুই হবে না। কেউ না জেনে এমন মাহফিলে বসে গেলে এ ধরণের গোনাহ শুরু হওয়া মাত্রই উঠে চলে আসা উচিত। আফসোস, এভাবে দীনের কাজগুলো একে একে সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! হোদায়াতের জলসাগুলো গোমরাহীর মাধ্যম হচ্ছে!! অথচ দারুল উলূম দেওবন্দের স্পষ্ট ফতোয়া আছে, শরয়ী অপারগতা ছাড়া, উদাহরণত পাসপোর্ট করা, জমির দলীল করা, জাতীয় পরিচয়পত্র বানানো ইত্যাদি ছাড়া প্রাণীর ছবি তোলা, ভিডিও করা বিলকুল নাজায়েয। বলুন, ওয়াজ মাহফিলের ছবি তোলা ও ভিডিও করার ক্ষেত্রে কী অপারগতা আছে? হ্যাঁ, কিছু ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ হতে ছবি তোলার বাধ্যবাধকতা থাকে। কিন্তু সরকার কি ওয়াজ মাহফিলের ছবি তুলতে আয়োজকদেরকে বাধ্য করেছে? আমার জানামতে ওয়াজ মাহফিলের ছবি তুলে বা ভিডিও করে থানায় জমা দেয়ার কোন বাধ্যবাধকতা এমনকি অনুরোধও নেই। তাহলে আমরা কেন এমন কাজ করতে যাব? কাজেই যে সমস্ত উলামায়ে কেরাম পুরোপরি হকের পথে আছেন, কোন জাহেরী গোনাহের সাথে জড়িত নন, বাছাই করে করে তাদের সঙ্গে থাকা, তাদের মজলিসে যাওয়া, তাদের কথা শোনা এবং তাদের অনুসরণ ও অনুকরণ করা উচিত। নিজের দীন ও ঈমান রক্ষা করার এটাই একমাত্র উপায়, এর কোন বিকল্প নেই। কাজেই যেখানে বা যে মাহফিলে গিয়ে গোনাহ হতে দেখবেন, সোজা উঠে চলে আসবেন। কেননা, আপনি গিয়েছেন হেদায়াতের প্রত্যাশায়, আর শুরু হয়ে গেছে গোমরাহী! তো কুরআনে পাক আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছে–

فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.

অর্থাৎ তুমি যখন বুঝতে পারলে এরা আল্লাহর নাফরমানী করছে, উঠে চলে আসো, এদের সঙ্গে বসে থেকো না; চাই এতে যে যা-ই মনে করুক! সুতরাং কাউকে খুশি করার জন্য বা কারও গোস্বা থেকে বাঁচার জন্য ওখানে বসে থাকা যাবে না। কারণ, لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق। অর্থাৎ মাখলুককে খুশি করার জন্য আল্লাহকে নারাজ করা যাবে না, তাঁর নাফরমানী করা যাবে না!

হাদীসে এসেছে, এক যামানা আসবে, যখন দীনের উপর টিকে থাকা এমন কঠিন হবে, যেমন কঠিন হয় আগুনের টুকরা হাতে ধরে রাখা। মুহতারাম হাযেরীন! বর্তমানে সে যামানা এসে গেছে। মানুষ এখন সকালে মুমিন, আর বিকেলে কাফের হয়ে যাচ্ছে। সামান্য সামান্য বাহানায় নিজেদের দীন-ঈমান নষ্ট করে ফেলছে। এজন্য এখন আর যে কোন ওয়াজ মাহফিলে যাচাই বাছাই ছাড়া অংশগ্রহণ করা যাবে না। আগে জানতে হবে, সেখানে কোন গোনাহের কাজ হবে কিনা? অনুরূপভাবে যেসব বক্তা ওয়াজ করবে তারা হক কথা বলবে কিনা এটাও যাচাই করে নিতে হবে। আজকাল অনেক বক্তা নিজেই ভিডিও করার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আসে, ফটোগ্রাফার ভাড়া করে নিয়ে আসে। আবার কোন কোন বক্তা টেলিভিশনে প্রোগ্রাম করে। এরূপ বক্তা তো নিজেই গোমরাহ। এমন লোককে দাওয়াত করে বয়ান শুনলে কী ফায়দা হবে, যে কিনা নিজেই গোমরাহ এবং যে কিনা পয়সার কাছে বিক্রি হয়ে গেছে? এরা মাহফিলে বসেই দাওয়াত দিচ্ছে যে, অমুক দিন অমুক টেলিভিশনে আমার প্রোগ্রাম আছে, আপনারা দেখবেন! তো তারা টেলিভিশন দেখার দাওয়াত দিচ্ছে, আর আমরা চুপচাপ শুনে যাচ্ছি! প্রতিবাদ করছি না যে, আমরা কি আপনাকে গোমরাহীর দিকে ডাকার জন্য দাওয়াত করেছি? বস্তুত আমাদের দিল মরে গেছে; আমাদের অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে! কোন অন্যায় কাজ দেখলে, হারাম কাজ দেখলে তার প্রতিরোধ করা, প্রতিবাদ করার যে ঈমানী শক্তি ও স্পৃহা দরকার আমরা তা হারিয়ে ফেলেছি। হাদীসে এসেছে–

من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.

অর্থাৎ কোন অন্যায় দেখলে, কাউকে হারাম কাজে লিপ্ত দেখলে হাতের দ্বারা সেটা পরিবর্তন করে দাও। তা না পারলে মুখের কথা দিয়ে পরিবর্তন কর। তা-ও না পারলে অন্তত মনে মনে সেটা পরিবর্তন করার ফিকির কর। কিন্তু এই সৎসাহস আজ মুসলমানদের মধ্যে নেই। যে-যা উল্টাপাল্টা করছে, আমরা চোখ বুজে সব মেনে নিচ্ছি, সবকিছু বরদাশত করে যাচ্ছি। এমনকি অন্যায় কাজকে দীনের কাজ মনে করে তাতে সহযোগিতা করছি। আমাদের আকল-বুদ্ধি কোথায় গেল? বিচার-বিবেক কোথায় গেল? গোনাহকে যদি গোনাহ মনে না করা হয়, গোনাহকে যদি হালাল মনে করা হয় তাহলে ঈমান চলে যায়। গোনাহকে গোনাহ মনে করা জরুরী। কেউ যদি গোনাহকে গোনাহ মনে করে তাতে লিপ্ত হয় তাহলে সে ফাসেক হয়ে যায় বটে, কিন্তু ঈমানটা অন্তত রক্ষা পায়। পক্ষান্তরে গোনাহকে হালাল ও জায়েয মনে করে করলে ঈমান চলে যায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাজত করুন।

শুরুতে বলেছিলাম, বর্তমানে দীনের নামে নতুন নতুন ফেরকা তৈরি হচ্ছে, যাদের কথা দীন ও ঈমান বিধ্বংসী। বলা হচ্ছে, কুরআন বুঝে পড়া ওয়াজিব। এর সরল অর্থ হল, কেউ না বুঝে পড়লে

তার ওয়াজিব তরক করার গোনাহ হবে। কত বড় গলত কথা! অথচ সওয়াব পাওয়ার জন্য অর্থ বুঝা শর্ত নয়। কুরআনে কারীমের শুরুতে যে আলিফ-লাম-মীম লেখা আছে, এর অর্থ তো খোদ সাদ সাহেবও জানেন না, কিয়ামত পর্যন্ত জানা সম্ভবও নয়। অনুরূপভাবে নামাযে যেসব সূরা পড়া হয়, সেগুলোর অর্থ কি আমরা সবাই জানি? জানি না। তাহলে তো তার কথা অনুযায়ী অর্থ না জেনে পড়ার কারণে গোনাহগার হচ্ছি। আবার বিভিন্ন নবীদের সমালোচনা করা হচ্ছে। এমনকি আমাদের নবীজীও বাদ পড়েননি। হ্যাঁ, দীনের নামে আজ এমন সব ফেরকাও তৈরি হচ্ছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

অর্থাৎ নিকৃষ্টতম কাজ হল, দীনের নামে নতুন কিছু উদ্ভাবন করা। আর দীনের নামে উদ্ভাবিত প্রতিটি জিনিস বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী। আর প্রত্যেক গোমরাহী মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

এজন্য দীনের নামে কোন কিছু হচ্ছে শুনলেই সেদিকে দৌড় দেয়া যাবে না। আগে যাচাই করে নিতে হবে যে, সেখানে যারা কথা বলবে, তারা আল্লাহওয়ালা কিনা, ইলমওয়ালা কিনা। আজকাল সুর শোনার জন্য বক্তা আনা হচ্ছে, কালেকশনের জন্য বক্তা আনা হচ্ছে। পোস্টারে লেখা আছে বিরাট ওয়াজ মাহফিল, পরে দেখা গেল বিরাট কালেকশন মাহফিল। এই তরীকায় কালেকশন করার এবং ধোঁকাবাজি করে মানুষের পকেট খালি করার অনুমতি ইসলাম দেয় না। এজন্য কোন মাহফিলে যেতে হলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, হক্কানী উলামায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করে যাবেন। যাতে হেদায়াত আসে, গোমরাহী না আসে এবং ঈমান বাড়ে, নষ্ট না হয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বোঝার তাওফীক দান করুন।

মোটকথা, কোন নতুন ফেরকায় শরীক হবেন না। চৌদ্দশত বছর ধরে হক্কানী উলামায়ে কেরাম যা বলে আসছেন, তার ওপর অটল থাকতে হবে। যারাই নতুন কিছু আবিষ্কার করেছে, তারাই গোমরাহ হয়ে গিয়েছে। উদাহরণত শিয়ারা কাফের কেন? এজন্য যে, তারা মনগড়া জিনিস ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করেছে। তারা বিশ্বাস করে, তাদের বারো ইমামের মর্যাদা নাকি নবী-রাসূলদের চেয়েও বেশী। নাউযুবিল্লাহ। ব্যস, এরা কাফের হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে কাদিয়ানীরা কাফের কেন? তারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বশেষ নবী মানে না। বরং তারা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে তাদের নবী মানে। কাদিয়ানীরা অনেক সময় সাধারণ মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য বলে, আমরাও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী মানি, এমনকি সর্বশেষ নবীও মানি; তবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আসল নবী, আর গোলাম আহমদ কাদিয়ানী হল ছায়ানবী। কত মারাত্মক ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা! আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা-বিশ্বাস হল, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন খাতামুন্নাবিয়্যিন বা সর্বশেষ নবী এবং তাঁর পরে আসল-ছায়া কোনও ধরণের নবী-রাসূল দুনিয়াতে আসবেন না, আসতে পারেন না। কুরআনে কারীমের প্রায় একশত আয়াত ও পাঁচশতাধিক হাদীস দ্ব্যর্থহীনভাবে একথা প্রমাণ করছে। হ্যাঁ, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কিয়ামতের কিছুকাল আগে আবারও পৃথিবীতে আসবেন। তবে নবী হয়ে নয়, আমাদের নবীজীর উম্মত হয়ে। এ সময় তিনি আমাদের নবীর শরীয়ত অনুযায়ী খিলাফত প্রতিষ্ঠা ও বিচার-আচার করবেন। মোটকথা, কাদিয়ানীরা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বশেষ নবী না মানার কারণে কাফের হয়ে গেছে।

তবে দুনিয়ায় যত বাতিল ফেরকা আছে, সবাইকে দেখা যায়, তারা সাহাবায়ে কেরামের দোষচর্চা করে। সাহাবায়ে কেরামকে দুশমন মনে করে। এই তো কিছুদিন আগে ভারতের এক আলেম মন্তব্য করেছে, সাহাবায়ে কেরামেরও 'জারহ' (সমালোচনা) হওয়া উচিত! যেখানে নবীজী হুশিয়ার করে দিচ্ছেন, আমার সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা লানতের কাজ, অভিশাপের কাজ, সেখানে একটা বড় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হয়ে মন্তব্য করেছে, সাহাবায়ে কেরামের দোষচর্চা হওয়া উচিত! অথচ সাহাবায়ে কেরাম কত বড় উচ্চমর্যাদার অধিকারী! যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে নবীজীকে জীবনে মাত্র একবার এক সেকেণ্ডের জন্য হলেও দেখেছেন এবং ঈমানের হালতে তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী দুনিয়ার সমস্ত বড় বড় ওলী-আউলিয়া মিলেও তার সমমর্যাদার হতে পারবে না। আফসোস! শত আফসোস!! আলেম-উলামার লেবাসে, মাদরাসার সাইনবোর্ডে আজ মন্তব্য করা হচ্ছে যে, সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা হওয়া উচিত! জাতি এদের থেকে গোমরাহী ছাড়া আর কী পাবে!?

এর বিপরীতে দেখুন, কয়েকদিন আগে দেওবন্দের শাইখুল হাদীস, মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী দা.বা. সিলেটের এক মাদরাসার মাহফিল উপলক্ষে বাংলাদেশে আগমন করেছিলেন। শুনেছি, তিনি আসার পর জানতে পারলেন, স্টেজে ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। শুনে তিনি আর স্টেজে উঠলেন না। বললেন, আমি এত কষ্ট করে তোমাদের সঙ্গে গোনাহে শরীক হতে আসিনি! পরে ক্যামেরা সরিয়ে দেয়া হলেও তিনি আর স্টেজে গেলেন না। মুহতামিম সাহেব তার পায়ে পড়ে গেলেন, হুযূর! বয়ান না-হয় না করলেন, স্টেজে গিয়ে শুধু দু'আ করে দিন। তিনি তা-ও গেলেন না। বললেন, যে স্টেজে এতক্ষণ ধরে তোমরা গোনাহের কাজ করেছো, সেখানে আমি কিছুতেই যাবো না। দীনী মর্যাদাবোধসম্পন্ন এ ধরণের ব্যক্তিবর্গকে বলা হয় আলেম। এদেরকেই বলা হয় আল্লাহওয়ালা ও হক্কানী। আমাদের দুর্ভাগ্য, এদেরকে দেখেও আমরা নসীহত হাসিল করি না, শিক্ষা গ্রহণ করি না!

এজন্য আপনাদের খেদমতে আরজ, দীনের কাজ তো করতেই হবে, তবে বুঝেশুনে করতে হবে। যে মাহফিল সহীহ তরীকায়, বিশুদ্ধ সুন্নাত অনুযায়ী, গোনাহমুক্তভাবে আয়োজন করা হয় এমন মাহফিল একটা খুঁজে পেলে ওই একটাতেই শরীক হোন। না পেলে শরীক হওয়ার দরকার নেই। দীনের নামে অখাদ্য-কুখাদ্য গ্রহণ করার কোন দরকার নেই। হেদায়াতের নামে গোমরাহী খরিদ করার দরকার নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তামাম গোমরাহী থেকে হেফাজত করুন।

অনুলিখন : মাওলানা আবূ সাইম
ইমাম ও খতীব, বসিলা বড় মসজিদ,
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

সা ক্ষা ৎ কা র

হাকীমুল ইসলাম হযরত কারী তায়্যিব সাহেব রহ.-এর সাক্ষাৎকার

মুফতী মাহমূদ আশরাফ উসমানী দা.বা.

مفتی محمود اشرف عثمانی دامت برکاتہم

(আল-বালাগ, ১৪১৫ হিজরী মুতাবেক, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ সংখ্যার মুখবন্ধ)

আজ থেকে বিশ বছর পূর্বে, ১৩৯৪ হিজরী মুতাবেক ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে অধম যখন জামি'আ ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারায় শিক্ষানবীস ছিলাম, তখন একবার হযরত হাকীমুল ইসলাম মাওলানা কারী তায়্যিব সাহেব রহ. মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করলেন। আলহামদুলিল্লাহ! সে সময় আমার হযরতের খেদমতে হাজিরা দেওয়ার এবং তাঁর ভালোবাসায় সিক্ত হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিলো। সেই সুযোগে মুহতারাম জনাব কারী বশির আহমাদ সাহেব দা.বা.-এর বাসায় (যেটি সে যুগে উপমহাদেশের বুযুর্গদের অবস্থানস্থল ছিলো) দীনী মাদরাসাসমূহের বর্তমান পরিস্থিতির উপর হযরত থেকে একটি যুগান্তকারী সাক্ষাৎকার নেয়ারও সৌভাগ্য হয়েছে। ইচ্ছে ছিলো, তখনই এটি ক্যাসেট থেকে লিপিবদ্ধ করবো এবং আল-বালাগে ছাপতে দেবো। কিন্তু আল্লাহর ফায়সালা! সাক্ষাৎকারটি কোন কারণে তখন আর লিপিবদ্ধ করা যায়নি। আজ বিশ বছর পর ক্যাসেটটি ফের আমার হাতে এসেছে। পুরো সাক্ষাৎকার দ্বিতীয়বার শুনলাম। মনে হলো, এর গুরুত্ব এখনো অপরিসীম।

হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারী তায়্যিব সাহেব রহ. দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ.-এর দৌহিত্র। হযরত কারী তায়্যিব সাহেব রহ. হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর শুধু খলীফা-ই ছিলেন না; ছিলেন আকাবিরে দেওবন্দের সকলের চোখের শীতলতা এবং তাঁদের মেযাজ, মাসলাক ও চিন্তাধারার বিশ্বস্ত আমানতদার। সুদীর্ঘ প্রায় ষাট বছর অবধি তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দারুল উলূম দেওবন্দের মতো প্রতিষ্ঠানের মুহতামিমের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। তাই দীনী মাদরাসাসমূহের বাস্তবচিত্র এবং তার সংশোধনের পথ ও পন্থার ব্যাপারে হযরত কারী সাহেবের পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্ববহ। সাক্ষাৎকারের বয়স বিশ বছর পেরিয়ে গেছে; তবুও যেন সেই আগের মতোই সতেজ ও ফলপ্রসূ রয়ে গেছে; দীর্ঘবিরতিতে এর প্রয়োজন একটুও ফুরিয়ে যায়নি। বরং দীনী মাদরাসাসমূহের চলমান পরিস্থিতিতে এর গুরুত্ব যেন উত্তপ্ত মরুভূমিতে একপশলা বৃষ্টির মতো।

সাক্ষাৎকারটি ক্যাসেট থেকে কাগজে স্থানান্তরিত করার সময় লেখালেখির ধরণ অবলম্বনের পরিবর্তে যথাসম্ভব হুবহু হযরতের শব্দ, বাক্য ও তাঁর বাচনভঙ্গির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার চেষ্টা করেছি, যেন তাঁর দিলের তড়প ও আত্মার আকুতি ব্যাহত না হয়। আশা করি, দীনী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহল পূর্ণ মনোযোগের সাথে পড়বেন এবং মুহতারাম শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এর আলোকে নিজেদের করণীয় নির্ধারণ করতে সচেষ্ট থাকবেন। আল্লাহ তা'আলাই সর্বোত্তম তাওফীকদাতা।

–আহকার মাহমূদ আশরাফ উসমানী
৫ জুমাদাল উলা, ১৪১৫ হিজরী

(দ্বিতীয় মুদ্রণের মুখবন্ধ)

আমি আহকার মাহমূদ আশরাফ ১৩৯৪ হিজরী মুতাবেক ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে মাসিক আল-বালাগ-এর জন্য হযরত কারী তায়্যিব সাহেব রহ. থেকে নিম্নলিখিত সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করি। জুমাদাল উখরা, ১৪১৫ হিজরী মুতাবেক নভেম্বর, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ সংখ্যায় প্রথমবারের মতো এটি আল-বালাগে ছেপেছিলো। এখন ফের দ্বিতীয়বারের মতো ছাপা হচ্ছে। সাক্ষাৎকারটির চল্লিশ বসন্ত পেরিয়ে গেলেও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য এর প্রয়োজন এতটুকুও ফুরিয়ে যায়নি। সবার জন্যে রয়েছে এতে সোনার হরফে লিখে রাখার মতো গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ও দিকনির্দেশনা। তবে এই সংস্করণে অধমের তরফ থেকে কয়েক স্থানে টীকা সংযোজন করা হয়েছে। এগুলো শুধুই আমার কথা।

প্রশ্ন : দীনী মাদরাসাসমূহের বর্তমান পরিস্থিতির ব্যাপারে হযরত কি সন্তুষ্ট?

উত্তর : আপনার প্রশ্নটি নেসাব বা পাঠ্যক্রম সম্পর্কে হলে বলব, হ্যাঁ, এটি পুরোপুরিই সন্তোষজনক। এটা সেই নেসাব যার মাধ্যমে জগদ্বিখ্যাত, প্রথিতযশা আলেম-উলামা তৈরি হয়েছেন। হ্যাঁ, আনুষঙ্গিক যৎসামান্য সংযোজন-বিয়োজন তো পূর্বেও হয়েছে, আগামীতেও হবে। তবে উচ্চস্তরে মৌলিক পরিবর্তন কখনও হবার নয়। যেমন, সিহাহ সিত্তাহ ও কুরআনে কারীমের তা'লীম। এছাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে তো সামান্য পরিবর্তন-পরিবর্ধন নিয়মিতই ঘটে চলছে। কিন্তু মূল নেসাব আগে যা ছিল সেটিই রয়ে গেছে। এজন্য নেসাবের ব্যাপারে আমি পুরোপুরিই সন্তুষ্ট।

দ্বিতীয় কথা, পাঠদান পদ্ধতি এখন কিছুটা বদলে গেছে। ফলে আমি মনে করি, এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া শিক্ষার্থীদের ইস্তি'দাদের (যোগ্যতা) উপরও পড়ছে। একটু খুলে বললে বিষয়টা এমন যে, পূর্বেকার শিক্ষকবৃন্দ সংক্ষিপ্তাকারে শুধুমাত্র কিতাবের ইবারত (মূলপাঠ)-এর মতলব (মর্মার্থ) ইবারতের উপর প্রয়োগ করে এমনভাবে শিক্ষার্থীদের দিল ও দেমাগে বসিয়ে দিতেন যে, শিক্ষার্থীরা নিজেরাই কিতাব বুঝে নিতে পারতো। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীরা যখন কিতাব দেখতো তখন ইবারতের মতলব বা উদ্দেশ্য তাদের সামনে আয়নার মতো ভেসে উঠতো। আর এখন সবাই মাসআলা সামনে রেখে নিজের জ্ঞানের ব্যাপ্তি প্রকাশ করেন। সুদীর্ঘ তাকরীর ও আলোচনা করতে থাকেন। এতে শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিনষ্ট হচ্ছে। প্রতিভা বিনষ্ট হবার একটি কারণ তো এটি। ভিন্ন আরেকটি কারণ হলো, যখন

থেকে প্রজাতন্ত্রের নামে গণতন্ত্রের সূচনা হয়েছে, সবাই কেমন যেন মুক্ত-স্বাধীন হয়ে গেছে। তরুণ শিক্ষার্থীদের মাঝেও এর বিরূপ প্রভাব পড়েছে। এতে বড়দের সাথে জনসাধারণ ও শিক্ষার্থীদের যে সুসম্পর্ক ছিলো, সেখানেও ঘাটতি দেখা দিয়েছে এবং ইলমী ইস্তি'দাদেও ঘাটতি দেখা দিয়েছে। আমি মনে করি, মূল বিষয় হচ্ছে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সম্পর্ক হতে হবে গভীর। শিক্ষকের প্রতি আদব, তাযীম, শ্রদ্ধাবোধ থাকতে হবে এবং তাদের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল হতে হবে। এখানে যতোটা ঘাটতি দেখা দেবে, প্রতিভাও ততোটা হ্রাস পেতে থাকবে। বর্তমান পরিস্থিতির কারণে আদব-আখলাকেও ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। আর পাঠদান পদ্ধতি বদলে যাওয়ার ফলে মূল শিক্ষায়ও এর প্রভাব পড়ছে। তাই ইস্তি'দাদও দিন দিন কমতে শুরু করেছে। এছাড়া মূল নেসাব সম্পর্কে বলবো, আলহামদুলিল্লাহ! সন্তোষজনক। আর মাদরাসাসমূহের মধ্যে, সাধারণত বড় মাদরাসার শিক্ষকগণ যোগ্যতা-সম্পন্ন হয়ে থাকেন। আর ছোট মাদরাসায় সবধরনের শিক্ষকেরই দেখা মিলে।

প্রশ্ন : কেউ কেউ মাদরাসার সিলেবাসে পরিবর্তন আনার কথা বলছেন। সাথে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়েরও পরামর্শ দিচ্ছেন। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

উত্তর : তাদের এই দাবি কিছুটা যৌক্তিক এবং আমরা বিষয়টি কার্যকরও করেছি। আধুনিক শিক্ষার কিছু বিষয় আকীদা-বিশ্বাসের উপর প্রভাব ফেলছে, চাই সেটা ভুলভাবে বোঝার কারণেই হোক না কেন। যেমন সাইন্স, আধুনিক দর্শন, আধুনিক বিজ্ঞান। কিছু মানুষ এগুলোকে দীনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। অথচ এগুলো দীনকে শক্তিশালী করার মাধ্যম। প্রকৃত সাইন্স যতো অগ্রসর হবে, আমি মনে করি ইসলামের শক্তি ততো বাড়বে। কারণ, ইসলাম আকীদা-বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে যে সকল দাবি করেছে, সাইন্স তার স্বপক্ষে দলীল উপস্থাপন করছে। তো দাবি আমরা করছি, আর দলীল উপস্থাপন করছে দীন অস্বীকারকারীরা। আল্লাহ তা'আলা তাদের দিয়েই আমাদের দলীল যোগাড় করিয়ে দিচ্ছেন। সুতরাং সাইন্স আমাদের জন্য বিপদজনক নয়, বরং সাহায্যকারী। সাইন্সের যে কুপ্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে তা মূলত পরিবেশ-পরিস্থিতির; সাইন্সের নয়। শিক্ষক যদি সঠিকভাবে পড়ান তবে এর দ্বারা দীন আরও শক্তিশালী হবে।[১]

প্রশ্ন হতে পারে, আগের যুগেও তো মাদরাসাগুলোতে দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র ইত্যাদি পড়ানো হতো, কিন্তু শিক্ষার্থীদের ওপর তার মন্দ প্রভাব তখন কেন পড়েনি? আর এখন কেনই বা পড়ছে? এর কারণ তো এটাই যে, পূর্বেকার শিক্ষকবৃন্দ আকীদা-বিশ্বাসের প্রশ্নে পাহাড়সম সুদৃঢ় ছিলেন। ফলে এসব পড়া সত্ত্বেও শিক্ষার্থীদের আকীদা-বিশ্বাসে নূন্যতম ফাটল সৃষ্টি হতো না। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানের অধিকাংশ শিক্ষকের অবস্থা হচ্ছে, না তাদের নিজেদের স্বভাব-চরিত্রের বালাই আছে, আর না তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ঠিক আছে। ফলে শিক্ষকের মন্দ স্বভাব শিক্ষার্থীদেরকেও প্রভাবিত করছে। আর মানুষ মনে করছে, এটা বিজ্ঞানের কুপ্রভাব! এই অপারগতা মূলত সাইন্সের নয়, বরং শিক্ষকের, যিনি শিক্ষার্থীদেরকে বিকৃতভাবে পড়াচ্ছেন। নতুবা ইসলামে সংকীর্ণতা নেই। ইসলাম তো সবরকমের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অনুমতি দিয়েছে। তবে নির্দিষ্ট কিছু জ্ঞান আহরণ থেকে শুধু এজন্যই বারণ করেছে যে, তা আমাদের জন্য উপকারী নয়। যেমনটা বর্ণিত রয়েছে- كلمة الحكمة ضالة الحكيم، حيث وجدها فهو احق بها، এ সকল রেওয়ায়াত থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, আর যাই হোক– জ্ঞান মূর্খতা থেকে উত্তম। তবে কিছু জ্ঞান অন্বেষণ অনর্থক বৈ নয়। কেননা, তার মূলেই রয়েছে ভ্রষ্টতা।

মোটকথা, সত্যিকার জ্ঞান-বিজ্ঞান তা যে কোন বিষয়েই হোক, মন্দ প্রভাব সৃষ্টি করে না। হ্যাঁ, শিক্ষকের প্রভাব অবশ্যই শিক্ষার্থীদের উপর পড়ে। শিক্ষকের চলনবলন ও আখলাক যদি ভালো হয়, শিক্ষার্থীরাও সেই সাজে সজ্জিত হবে। আর যদি তিনি নিজেই অসৎ চেতনা ও মন্দ স্বভাবের ধারক হন, তবে তো তিনি কুরআন-হাদীস থেকেও শিক্ষার্থীদেরকে ভ্রষ্টতা শেখাবেন। সুতরাং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে যদি শুধু এতোটুকু নেয়া হয়, যেটুকু দীনের জন্য সাহায্যকারী, অথবা খোদ সেটাই দীনের উপর আরোপিত সকল অযৌক্তিক অভিযোগের খণ্ডন করে, তবে মৌলিকভাবে আমি মনে করি, অবশ্যই তা হাসিল করা উচিত।

প্রশ্ন : হযরত! আপনি যে শিক্ষার্থীদের নৈতিক অবক্ষয়ের কথা বলছিলেন, আসলে আমরা তো বড়দের থেকে শুনে আসছি যে, আগের যামানায় মাদরাসা ও খানকা আলাদা কিছু ছিলো না, বরং সে সময় উভয়টাকে অভিন্ন গণ্য করা হতো। মাদরাসাকেই খানকা বলা হতো, সেখানে শিক্ষার্থীদের সঠিক শিক্ষা দেয়া হতো এবং শিক্ষার সাথে সমপরিমাণে নীতি-নৈতিকতার দীক্ষাও দেয়া হতো। কিন্তু, এখন এসে সেই চিত্র কেন বদলে গেলো? এবং পুনরায় তা ফিরিয়ে আনার উপায় কী?

উত্তর : এটা শতভাগ সত্য যে, আগের যুগে মাদরাসা ছিলো মূলত খানকা। তার উপর শুধু শিক্ষার আবরণ ছিলো। এটাতো আর বলা হতো না যে, আমরা তাসাওউফ, তরীকত শেখাচ্ছি। কিন্তু সেসব মনীষীদের কর্মপন্থা, দায়িত্ববোধ ও কর্মদক্ষতা এতোটাই উৎকর্ষপূর্ণ ছিলো যে, তাঁদের মজলিসে বসলে আপনা-আপনিই স্বভাব-চরিত্র ঠিক হয়ে যেতো। এখন তো বলতেই হবে, শিক্ষকদের মাঝেও কিছু ঘাটতি দেখা দিয়েছে। যাই হোক! বাস্তবতা হচ্ছে, ব্যাপকভাবে এখনকার শিক্ষকদের আত্মসংশোধনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ নেই। নতুনভাবে যারাই শিক্ষক হচ্ছেন, বেশিরভাগই এ ব্যাপারে উদাসীন।

প্রশ্ন : হযরত এর কারণ কি এমন কিছু যে, এখন আর আগের মতো ছাত্র-শিক্ষকের মাঝে সেই সম্পর্ক নেই?

উত্তর : আমি তো মনে করি, সকল ফিতনার মূল কারণ এটাই। শিক্ষার্থীদের স্বভাব ও পরিস্থিতি এতোটাই বদলে গেছে যে, শিক্ষকের প্রতি যে মর্যাদাবোধ, ভালোবাসা, আস্থা ও বিশ্বাস ধারণ করার কথা ছিলো তা এখন নেই বললেই চলে! আর বিবর্তনের ছোঁয়া কিছুটা শিক্ষকদেরও স্পর্শ করেছে। যেমনটা বলা হয়- کچھ لوہا کھوٹا، کچھ لوہار کھوٹا، শিক্ষকগণ চরিত্রের যে মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়ার কথা ছিলো, নতুন শিক্ষকদের মাঝে তা অনেক কম। যার ফলে শিক্ষার্থীদের উপরও প্রভাব পড়ছে। এটা ভিন্নকথা যে, এই নবীন শিক্ষকরাই কিছুকাল পর প্রবীণ হয়ে আরো উন্নতিসাধন করবেন। কিন্তু বলতে চাচ্ছি, এখনকার নবীন শিক্ষকদের সেই প্রতিভা

১. আহকার এই কথাটিই স্বীয় দাদা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব রহ. থেকে শুনেছি যে, শিক্ষক যদি সঠিক চিন্তা-চেতনার অধিকারী না হন তবে তিনি নূরুল ইযাহ থেকেও শিক্ষার্থীদের 'ব্রেনওয়াশ' করে ছাড়বেন। আর যদি তিনি সঠিক চিন্তা-চেতনা লালন করেন তবে জাগতিক শিক্ষা থেকেও তিনি শিক্ষার্থীদের মাঝে তাকওয়া, পরহেযগারীর স্পৃহা জাগ্রত করবেন।

বা যোগ্যতা কোথায়, যা পূর্বেকার নবীন শিক্ষকদের মধ্যে ছিলো!

আমরা যখন শিক্ষানবীস ছিলাম, আমাদের শিক্ষকবৃন্দ জ্ঞান-গরিমা, তাকওয়া, পরহেযগারী, মোটকথা সর্বদিকেই তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ছিলো। হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এতোটাই পাবন্দ ছিলেন যে, তাঁকে দেখে আমরা মাসআলার সমাধান খুঁজে নিতাম। কিতাব খুললে দেখতাম, হুবহু তাঁর আমলের সাথে মিলে যেতো। তিনি এতোটাই উঁচু মাপের ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন! সর্বদা তারা আখেরাতের ফিকিরে বিভোর থাকতেন।

হযরত মাওলানা মুফতী আযীযুর রহমান সাহেব দুপুরে দেওবন্দের 'ছোটি মসজিদে' এসে কাইলুলা করতেন। অধিকাংশ সময় তিনি হাঁটু-পেট মিলিয়ে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে থাকতেন। এটা কখনো দেখা যায়নি যে, তিনি পা ছড়িয়ে শুয়ে আছেন। আমার শ্বশুর মৌলবী মাহমুদ সাহেব রামপুরী রহ. ছাত্র যামানায় মুফতী সাহেবের সাথে ছোটি মসজিদেই থাকতেন। প্রথম প্রথম দেখে তিনি মনে করেছেন, হয়তো কাকতালীয় ব্যাপার। কিন্তু যখন লক্ষ করলেন, বুঝতে পারলেন যে, এটা কাকতালীয় নয়; বরং তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস। একদিন তিনি জিজ্ঞেসই করে বসলেন, হযরত! আপনাকে যে কখনো পা ছড়িয়ে ঘুমোতে দেখি না? তিনি বললেন, 'ভাই! পা ছড়িয়ে শোয়ার যায়গা তো কবর, দুনিয়া নয়!' এ থেকেই বোঝা যায়, তাঁরা আখেরাতের ফিকিরে সবসময় কতোটা বিভোর থাকতেন। হযরত মুফতী সাহেবেরই ভিন্ন আরেকটি ঘটনা।

আমরা তাঁর কাছে জালালাইন শরীফ পড়েছি। দরসের একপর্যায়ে যখন সূরা নাজম-এর এই আয়াত আসল وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى অর্থ: 'মানুষ নিজে যা সঞ্চয় করেছে সেটাই সে আখেরাতে পাবে।' অর্থাৎ এমন নয় যে, আখেরাতে অন্যের সঞ্চয় তার কাজে আসবে। তো এই আয়াত দ্বারা বাহ্যিকভাবে মনে হয় যে, ঈসালে সাওয়াব অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তির কৃত নেক আমলের সাওয়াব মৃত ব্যক্তিকে বখশে দিলে মৃত ব্যক্তি উপকৃত হবে না। অথচ বিভিন্ন হাদীস দ্বারা ঈসালে সাওয়াব প্রমাণিত। অর্থাৎ হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী অন্যের সঞ্চয় বা নেক আমল মৃত ব্যক্তির কাজে আসবে। সুতরাং আয়াত ও হাদীসের মাঝে তা'আরুয (দ্বন্দ ও বৈপরীত্য) মনে হচ্ছে। যাই হোক, তিনি যখন পড়াতে পড়াতে এই আয়াতে পৌঁছলেন, তখন আমাদেরকে 'অন্যের সঞ্চয় কাজে আসবে'–এটাই বুঝিয়েছেন। কিন্তু সেই সাথে একথাও বললেন যে, আমি এই আয়াতের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত। এখন অবধি এর (আয়াত ও হাদীসের বাহ্যিক দ্বন্দ্ব) নিরসনের সুরত বুঝে আসছে না। একদিকে হাদীস বলছে, অন্যের সঞ্চয় আখেরাতে কাজে আসবে। অন্যদিকে কুরআন বলছে, কিছুতেই কাজে আসবে না। সাধ্যমতো কিতাব দেখলাম, কতো কিতাবের পাতা উল্টালাম, কিন্তু কোন সমাধানে যেতে পারিনি! যাই হোক, এ অবস্থায়ই তিনি ঘরে ফিরে গেলেন। গ্রীষ্মকাল ছিলো তখন। ঘরের আঙিনায় চৌকিতে শুয়ে আছেন। হঠাৎ মনে এলো, 'তুমি কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে সন্দিহান। এখন এ অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু এসে যায়, তবে আল্লাহর আয়াতের ব্যাপারে সংশয়, সন্দেহ নিয়েই তোমার দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে। এবার ভেবে দেখো, তোমার ঈমানের কী হাল হবে?' এটা তো স্রেফ ريب বা সামঞ্জস্য বিধানের পদ্ধতি নিয়ে সংশয় ছিলো, মূল আয়াতে নয়। ব্যস! এতেই হযরতের জযবা চলে আসলো! তৎক্ষণাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং সেই গভীর রাতেই পায়ে হেঁটে দেওবন্দ থেকে গঙ্গুহ'র উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন যে, হযরত রশীদ আহমাদ গঙ্গুহী রহ. থেকে এর সমাধান খুঁজে নেবো।

এ ঘটনা থেকে প্রথমত এ কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাঁদের মাঝে আখেরাতের ফিকির অত্যন্ত প্রবল ছিলো! ইলমকে তাঁরা শুধু রিসার্চ বা গবেষণা হিসেবে নিতেন না, বরং এটাকে আখেরাতের পুঁজিও মনে করতেন। কুরআনের একটি আয়াতে তাঁর একধরণের সংশয় দেখা দিলো, যাকে পরিভাষায় ريب বলা হয়। সুতরাং এর ফলে যদি ঈমান বিন্দুমাত্রও ত্রুটিযুক্ত হয়, তবে ঈমানের হালত কী হবে সেই ভয় তাঁকে পেয়ে বসলো। এটি একটি জযবা ছিলো; নিছক ইলমী তাহকীক নয়। তিনি পুরো রাত হেঁটে হেঁটে গঙ্গুহ সফর করলেন। অথচ তিনি হেঁটে সফর করতে একেবারেই অভ্যস্ত ছিলেন না। রাতের শেষ প্রহরে তিনি গঙ্গুহ পৌঁছলেন। ফজরের নামাযের সময় ছিলো। হযরত রশীদ আহমাদ গঙ্গুহী রহ. তখন উযু করছিলেন। তিনি আদবের সাথে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে সালাম করলেন। সালামের জবাব দিয়ে হযরত গংগুহী রহ. জিজ্ঞেস করলেন, কে? তিনি বললেন, আযীযুর রহমান। হযরত জিজ্ঞেস করলেন, এই অসময়ে!? রাতে এসেছো নাকি? বললেন, হযরত! রাতভর সফর করে এখনই পৌঁছলাম! হযরত বললেন, কী এমন প্রয়োজন হলো যে, পুরো রাত সফর করে আসতে হলো!? তিনি সেখানে দাঁড়িয়েই সেই প্রশ্ন পেশ করলেন যে, হযরত! আয়াতে 'নফী' বা নাকচ করা হয়েছে যে, আখেরাতে একজনের নেক আমল অন্যজনের কাজে আসবে না। অথচ হাদীসে এর 'ইসবাত' করা হয়েছে যে, একজনের নেক আমল অন্যজনের কাজে আসবে। এখন কুরআন ও হাদীসের মাঝে এই বাহ্যত তা'আরুয (বৈপরীত্যের সমাধান) আমার বুঝে আসছে না! হযরত গঙ্গুহী রহ. সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জবাব দিলেন, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى এই আয়াতে سعى তথা চেষ্টা-প্রচেষ্টা দ্বারা سعى ايمانى (ঈমানী চেষ্টা-প্রচেষ্টা) উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আখেরাতে একজনের ঈমান অন্যজনের নাজাতের উসিলা হবে না। এখানে আমলের 'নফী' করা হয়নি, যেমনটি তুমি ধারণা করেছো। পক্ষান্তরে হাদীস একথা প্রমাণ করছে যে, মৃত ব্যক্তির কাছে অন্যের 'আমল'-এর ফায়দা পৌঁছবে। সুতরাং আয়াত ও হাদীসের মাঝে কোনো তা'আরুয নেই। কেননা, আয়াতে ঈমান উদ্দেশ্য, আর হাদীসে আমল উদ্দেশ্য। আয়াতে যে বিষয়ের 'নফী' করা হচ্ছে, হাদীসে সেটার 'ইসবাত' নেই। আর হাদীস যেটি 'সাবিত' করছে, কুরআনে তার 'নফী'' নেই। সুতরাং তা'আরুয কোত্থেকে আসলো? মুফতী আযীযুর রহমান সাহেব বলতেন– 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই জবাব শুনে আমার মনে হলো, আমার ভেতরে যেন ইলমের একটি গভীর সমুদ্রের তলদেশ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে।' তাহলে ভেবে দেখুন, কুরআন সুন্নাহর প্রতিটি শব্দে আমাদের আকাবিরদের ইলম কতোটা গভীর ছিলো!

এরকমই আরেকটি ঘটনা শুনুন! হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ.-কে কেউ জিজ্ঞেস করলো, হযরত! হাদীস শরীফে বিদ'আত থেকে বারণ করে বলা হয়েছে, من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد অর্থাৎ যে আমাদের দীনের মধ্যে এমন কিছু উদ্ভাবন করে, যেটা দীনের মেযাজের খেলাফ, তা পরিত্যাজ্য।

(২৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

তাবলীগে মহাসঙ্কট : দায় কার

উবায়দুর রহমান খান নদভী

যুগে যুগে ইসলামের প্রচারে নতুন ও যুগোপযোগী কৌশল দেখা গেছে। প্রায় এক শতাব্দী আগে উপমহাদেশে জনগণের কাছে তাদের দীন ঈমানকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দিল্লী থেকে একটি নতুন ধারার কাজ শুরু হয়। প্রথমে কান্ধালা, পরে দিল্লীর অধিবাসী মাওলানা ইসমাঈল রহ.-এর পুত্র মাওলানা ইলিয়াস রহ. এ ধারার কাজ শুরু করেন। যদিও এর আগে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. একই ধারার গণমুখী এই কাজ দিল্লীর একই এলাকায় শুরু করিয়েছিলেন। কিন্তু বহুমুখী কাজের চাপে তাবলীগের এ কাজ তিনি ব্যাপক করতে পারেননি। তার প্রিয় পাত্র মাওলানা ইলিয়াস রহ.-কে তাবলীগের কাজ অতুলনীয় আবেগ ও ত্যাগের সাথে করতে দেখে তিনি খুবই প্রীত হন এবং এর উপদেষ্টা ও শুভার্থী হিসাবে আজীবন সমর্থন দিয়ে যান। পাশাপাশি তার ঈমানী দূরদৃষ্টি ও অতুলনীয় প্রজ্ঞায় এ কাজের ব্যাপারে হাজারো আশঙ্কাও অন্তরে পোষণ করেন।

দাওয়াত বিষয়টি মূলত অমুসলিমদের জন্য। তাবলীগ অর্থ দীন মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। মূলত এর ক্ষেত্রও অমুসলিমরা। পরিভাষায় এর প্রয়োগ যাই হোক, আসলে মুসলিম সমাজে দীন পৌঁছানোর অর্থ হচ্ছে, তাদের ঈমান একীনের উন্নয়ন, আত্মশুদ্ধি ও তাদের দীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করা। শরীয়ত যাকে দাওয়াত, তাযকিয়া, তা'লীম ও তারবিয়াত বলে উল্লেখ করেছে। এ সম্পূর্ণ কাজটিই ছিল হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর তাবলীগ। তাবলীগী জামাআত তার দেওয়া নাম। প্রচলিত নাম দাওয়াত ও তাবলীগ। বাস্তবে যেটি তা'লীম ও তারবিয়াত।

তাবলীগ জামাআতে তা'লীম অর্থ দীনের প্রতিটি বিষয় জানার গুরুত্ব ও আগ্রহ মানুষের মনে তৈরি করা। তারবিয়াত মানে ঘর-বাড়ি থেকে দূরে একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশে মানুষকে নিয়ে কিছু দিন রাখা ও তার অন্তরকে আখেরাতমুখী বানানো। হাতে কলমে আমল শেখানো। ইসলামের হাজার বছরে এমন কর্মসূচি নিয়ে কোনো জামাআত ছিল কিনা, এ ধরনের কাজ শুরু করা ভালো হবে কিনা, এ নিয়ে মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর দ্বিধা সংশয় জীবনে এক সেকেন্ডের জন্যও দূর হয়নি। তিনি এ কাজের জন্য হযরত থানভীর দরবারে গিয়ে তার বিহিত মর্জি লাভের চেষ্টা করলে হযরত থানভী তাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার লোকেরা তাবলীগ করবে মানে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে। এটা তো আলেমদের কাজ। কারণ তারা কিছু জানেন, যা অপরকে পৌঁছে দিতে পারবেন। যারা কিছু জানে না, একান্তই সাধারণ মানুষ কিংবা সাধারণ শিক্ষিত হলেও দীনী শিক্ষায় অজ্ঞ। তারা মানুষের কাছে কী পৌঁছাবে? কী তাবলীগ করবে? তাবলীগ অর্থ তো পৌঁছে দেওয়া।

তখন হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. এককথায় উত্তর দিলেন, হযরত আপনার যে জ্ঞানভাণ্ডার, আপনার ইলমী ও ইসলাহী নির্দেশনা, আপনার মালফুযাত এসবই তারা মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবে। হযরত থানভী এ কথা শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হলেন।

মাওলানা ইলিয়াস রহ. এ প্রচারকার্যের ৬টি মূলনীতি তৈরি করলেন। তার মনে অনেক প্রশ্ন। এসব কি ঠিক আছে? গেলেন দেওবন্দের প্রধান মুফতী মাওলানা কিফায়াতুল্লাহ সাহেবের কাছে। ছয় নাম্বার তাকে দেখালেন। মুফতী কিফায়াতুল্লাহ সাহেব সব ওকে করলেও বিনয় ও ভদ্রতার খাতিরে মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর প্রস্তাবিত একটি নীতি সামান্য বদলে দিলেন। সম্ভবত এ বিনীত পরিবর্তনটিই সময়ে তাবলীগী প্রজন্মের জন্য কাল হয়ে দেখা দিয়েছে। তাদের এক শ্রেণির মধ্যে আলেম-ওলামা বিদ্বেষ যেন মজ্জাগত। নিজেদের বড় মনে করা, নবীওয়ালা কাজের একমাত্র ঠিকাদার মনে করা, নিজেদের কাজকেই আল্লাহর রাস্তা বলা, নায়েবে রাসূলদের হেয় জ্ঞান করা ইত্যাদি। হতে পারে এগুলো এ নীতিটি বদলে দেওয়ারই ফসল। ভদ্রতার ফলাফল এমনই হয়। নীতিটি ছিল 'ইকরামুল ওলামা' মানে, ওলামায়ে কেরামের খাতির তোয়াজ ও সম্মান। মুফতী সাহেব রহ. নিজের কলমে এ কথাটি কেটে লিখে দিলেন, 'ইকরামুল মুসলিমীন'। মানে, সব মুসলমানের প্রতি খাতির তোয়াজ ও সম্মান।

মাওলানা ইলিয়াস রহ. তাবলীগের ছয় উসূলের একটি বানিয়েছিলেন, ওলামাদের সম্মান। তিনি বলতেন, যেদিন ওলামায়ে কেরাম এ কাজটি নিয়ে যাবে সেদিনই আমার তাবলীগ সফল। তিনি তাবলীগের লোকদের বলতেন, তোমরা কোথাও গিয়ে কখনোই ওলামায়ে কেরামকে নিজেদের কাজের দিকে ডাকবে না, তাদের সাথে দেখা করে দোয়া চাইবে।

একদিন গভীর রাতে বর্ণিত মুফতী সাহেবের কাছে গিয়ে ঘরের দরজা আটকে দিলেন মাওলানা ইলিয়াস রহ.। একটি বড় ছুরি হুযূরের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, হয়তো আমার এ নতুন ধারার কাজটিকে আপনি শরীয়তের আলোকে সঠিক বলে ফতোয়া দিন, নয়তো এই ছুরি দিয়ে আমাকে জবাই করে ফেলুন। উম্মতের দুরবস্থা দেখে এমন একটি জামাআত তৈরি না করে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হয় এ কাজ আমি করব, না হয় জীবন দিয়ে দেব। এর কিছুদিন পর মাওলানা ইলিয়াস রহ. অতি দরিদ্রও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ইসলামের শিক্ষা প্রচারের কাজ শুরু করেন। প্রথম কেউ তার ডাকে সাড়া দিত না। তিনি নিজ পকেট থেকে শ্রমিকদের মজুরী দিয়ে তাদের কিছু সময় নিজের কাছে রেখে দীনী শিক্ষা দিতেন। দিল্লীর পার্শ্ববর্তী একান্ত অবহেলিত এলাকা মেওয়াতে এ কাজ শুরু হয়। নিযামুদ্দীন এলাকার বাংলাওয়ালী মসজিদ ছিল এর মারকায। এ জায়গাটি মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর পৈত্রিক সম্পত্তি। ওয়াকফ সূত্রে যার মুতাওয়াল্লী এখন মাওলানা সাদ সাহেব।

তাবলীগ তার প্রাথমিক সময় অতিক্রম করছে। এসময় হযরত থানভী রহ.-এর

ইন্তিকাল হয়। মাওলানা ইলিয়াস শোকে ভেঙে পড়েন। তিনি ময়দানের সব জামাআতকে খবর পাঠান। তোমরা কুরআন খতম করে করে আমার এ কাজের আদর্শ হযরত থানভী'র রুহে সওয়াব রেসানী কর। তার ফয়েয লাভ করতে পারলে এ কাজ বেশি বরকতময় হবে। হযরত থানভী'র কিতাবাদি পাঠ ও তা'লীম কর।

মাওলানা ইলিয়াস তার শেষ সময়ে খুব অস্থিরতায় ভুগছিলেন। এসময় মুফতী শফী রহ. নিযামুদ্দীনে গেলে তিনি মুফতী সাহেবকে বললেন, ইসলামে এ নতুন ধারার একটি কাজ শুরু করে গিয়ে আমি কি বড় কোনো ভুল করলাম? ভবিষ্যতে কি এটি অভিনব কোনো ফিতনার রূপ নেবে? আমার এ ব্যাপারে ভয় হচ্ছে। মুফতী শফী রহ. জবাব দিলেন, আপনার মনের এ ভয় ও সংশয় প্রশংসনীয় বিষয়। আপনার জীবদ্দশায় তো কাজ ঠিকই আছে। এ পর্যন্তই আপনার চিন্তা। পরে যদি নষ্টও হয়ে যায়, তাহলে এর দায় আপনাকে নিতে হবে না। মাওলানা ইলিয়াস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তখন তিনি বলতে গেলে মৃত্যুশয্যায় ছিলেন।

মাওলানা ইলিয়াস রহ. এ নতুন কাজে নিজ পুত্র দ্বিতীয় হযরতজী মাওলানা ইউসুফ রহ.-কে কিছুতেই লাগাতে পারছিলেন না। তখন তিনি এ ব্যাপারে মুফতী মাহমূদ হাসান গঙ্গুহীর নিকট সাহায্য চাইলেন। আশা করলেন, তিনি যেন মাওলনা ইউসুফকে পিতার কষ্টের কথাটি বুঝিয়ে বলেন। মুফতী মাহমূদ হাসান গঙ্গুহী রহ.-এর মুখ থেকে আমি নিজে এ ঘটনাটি শুনেছি। তিনি বলেন, আমার কথায় মাওলানা ইউসুফ তাবলীগে যোগ দিলেন। আমি বিস্মিত হলাম যে, কিছুদিন পর তিনি আমার সাথে একটি রেলজংশনে এসে এসময় দেখা করলেন, যখন আমি এ পথ দিয়ে রেলে যাচ্ছিলাম। বন্ধু মানুষ যোগাযোগ করে দেখা করতে এলে আমি খুশি হই। জানতে চাইলে তিনি বলেন, একটি মাসআলা নিয়ে বিপাকে পড়েছি, আপনাকে ছাড়া উপায় দেখছিলাম না। মুফতী গঙ্গুহী এ ফতোয়া বা সমাধানটি দিলেন। এরপর মাওলানা ইউসুফের একটি কথায় তিনি খুবই আশ্চর্যান্বিত ও হতভম্ব হয়ে গেলেন। যখন মাওলানা ইউসুফ তাকে বললেন, ভাই আল্লাহর রাস্তায় আপনিও কিছু সময় লাগান। মুফতী গঙ্গুহী আমাকে বলেন, একজন আলেম ওই কাজে যোগ দেওয়ার পর পরিবেশ থেকে এত দ্রুত প্রভাবিত হবে, তা আমার কল্পনায়ও ছিল না। কিছুদিন আগেও যে তার পিতার এ নতুন প্রয়াসকে জ্ঞানের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করত, আমার অনুরোধে সে পিতার আশা পূরণের জন্য সে কাজে যোগ দেয়। কিছুদিন পরই তার আলেমানা বিবেচনাবোধ ক্ষুণ্ন না হলে সে কী করে আমাকে বলে যে, আল্লাহর রাস্তায় কিছু সময় লাগান। আমি তখন কথা বাড়াইনি। ট্রেনও ছাড়ার সময় হয়ে গিয়েছিল। শুধু বিদায়ের বেলা বললাম, আল্লাহর রাস্তায় তুমিই থাকো ভাই। আমাদের মত মানুষদের ইলমে নববীর রাস্তায় থাকতে দাও। নতুবা তোমরা আটকে গেলে কার কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করবে?

এরপর মুফতী গঙ্গুহী রহ. দক্ষিণ আফ্রিকায় কড়া তাবলীগিদের সাথে তার আলাপ-আলোচনার অনেক কথাই আমার সামনে তুলে ধরেন। বলেন, শুরু থেকেই তাবলীগের আবেগ আর সামগ্রিক ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ প্রজ্ঞা, এ দু'টি বাস্তবতা মুখোমুখি একটি দ্বান্দ্বিক বৃত্তে অবস্থান করছিল। মাওলানা ইউসুফ ও মাওলানা ইন'আমুল হাসান এ দু'টি বিষয়কে কোনো রকম সমন্বিত রেখে সঠিকভাবে এগোচ্ছিলেন। বর্তমানে এ দু'টি ধারা সত্যিকার অর্থেই দুই মেরুতে চলে গিয়েছে। পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটছে। আমি জানি না, এ কাজ আর কতদিন গ্রহণযোগ্য ও সঠিক রাস্তার ওপর থাকবে। এর কিছুদিন পরই হযরত মাহমূদ হাসান গঙ্গুহী ইন্তিকাল করেন।

তাবলীগের সঙ্কট যদিও নতুন নয়, কিন্তু এটি অসহনীয় পর্যায়ে চলে যায় মাওলানা সাদ-এর একক আমীরত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টার পরে। সিনিয়র প্রায় সবাই বৈশ্বিক এ আন্দোলনের প্রধান হিসাবে তাকে মেনে নিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। ব্যবস্থাপনার দ্বন্দ্ব একসময় জনগণ পর্যায়ে প্রকাশিত হয়। আলেমগণ মাওলানা সাদের চিন্তাধারা ও কর্মনীতিকে তাবলীগের প্রথম দিককার মুরব্বীদের নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে জানিয়ে দেন।

তাবলীগ দু'টি ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। বাংলাদেশে এ দূরত্ব ও বৈপরীত্ব অধিক প্রকট হয়ে ওঠে। একসময় এটি খুন, যখম ও মারামারির পর্যায়ে চলে যায়। লজ্জার মাথা খেয়ে তাবলীগ এখন মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রণালয়ে ঘুরে। হাইকোর্টে যায় নালিশ নিয়ে। বিচারকরা বলেন, দীনের কাজ নিয়ে আপনারা কোর্টে আসেন, আমাদের লজ্জা লাগে। বাংলাদেশের বিবেচনায় এর নিরসন কেবল ওলামায়ে কেরামের মতামত ও সিদ্ধান্তের ওপরই ন্যস্ত। বিশ্ব তাবলীগের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য।

যেহেতু মাওলানা ইলিয়াস রহ. তার উস্তাদ, শায়েখ, পীর ও মুরব্বীদের কথা মেনে এ কাজ চালিয়ে গেছেন, পরের দুই হযরতজীও একইভাবে তাদের পূর্বসূরীর পথ অনুসরণ করেছেন, মাওলানা সাদ সাহেবকেও নিজের অভিজ্ঞতা, পছন্দ, বুঝ, জ্ঞান ইত্যাদির ওপর ভরসা ছেড়ে নিঃশর্তভাবে সময়ের সেরা ওলামায়ে কেরামের শরণ নিতে হবে। ওলামা-মাশায়েখের কথা চোখ বুজে মেনে নিয়ে তাবলীগের ব্যবস্থাপনায় জুড়ে থাকতে হবে। 'তিনিও আলেম, তার সাথেও আলেমরা আছেন, তার কথাবার্তাও যুক্তি ও প্রমাণ নির্ভর' ইত্যাদি বক্তব্য তাবলীগের বর্তমান সঙ্কটের সমাধান নয়। শুরু থেকে এর তাত্ত্বিক ও নীতিগত যে নির্দেশনা বিশেষজ্ঞ ওলামা ও বুযুর্গানে দীন দিয়ে এসেছিলেন, সে ধারায়ই তাবলীগ চলতে পারে। স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ধারায় নিজেকে ওলামায়ে কেরামের অমুখাপেক্ষী মনে করে যদি এর নেতৃত্ব চলতে চায়, তাহলে ইতিহাসের আরও অনেক পরিচিত অথচ গোমরাহ ফেরকার ভাগ্য বরণ করতে এই তাবলীগ জামাআতেরও বেশি দিন সময় লাগবে না।

দেশের তাবলীগ নির্ভর ধর্মীয় সমাজে এখন চরম বিপর্যয়। মসজিদে মসজিদে দু'টি করে দল। মা-বাবা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী পর্যায়ে ব্যাপক মতানৈক্য হিংসা-বিদ্বেষ ও মারাত্মক বিভেদ। বছরের পর বছর মিল মহব্বতের সাধনা করে যে শত্রুতার জন্ম হয়েছে, তা দূর হতে কত জীবন লাগবে আল্লাহই ভালো জানেন। ভালোবাসার চর্চা থেকে ঘৃণা সৃষ্টি হয়, এমনটি আর শোনা যায়নি। এখানে বুঝতে হবে, পদ্ধতিগত কোনো ত্রুটি ছিল। যার ফল বৈশ্বিক পর্যায়ে এত তিক্ত ও বিষময় হতে চলেছে।

সমাজ বিজ্ঞানের জনক আল্লামা আবদুর রহমান ইবনে খালদুন রহ. বলেছেন,

‘একটি সভ্যতারও একটি হায়াত থাকে। আমার অভিজ্ঞতায় ১০০ বছর পর সভ্যতারও কঠিন বাঁকবদল হয়। অনেক সময় মৃত্যুও ঘটে।’ এর ব্যাখ্যায় আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা বলেছেন, আন্দোলন, রাষ্ট্র, জাতি, সংগঠন ইত্যাদিরও কমবেশি ১০০ বছরে একটি পরিণতি আসে। যেমন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ১৯১৭ থেকে ১৯৯২, এ সময়ের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করেছে। তুরস্কের নাস্তিক্যবাদী সেক্যুলারিজম ১৯২৪ থেকে ২০০২ পর্যন্ত হায়াত পেয়েছে। গড়ে ৭০-৮০ বছরের বেশি বড় কোনো শক্তিই তার মূল রূপ ধরে রাখতে পারে না।

স্বয়ং অমর ও চিরস্থায়ী জীবনব্যবস্থা ইসলামেরও শতাব্দীতে নতুন মোজাদ্দেদের প্রয়োজন হয়। কারণ, মানুষ ও সমাজ বদলে যায়। নীতি আদর্শ পালনে উদাসীনতা নেমে আসে। নতুন সংস্কারক সব ঝেড়ে-মুছে আবার শুরু করেন। সমাজের শরীরে নতুন রক্ত প্রবাহিত করেন। তাবলীগ জামাআতের ক্ষেত্রেও ইলম ও ইহসানের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যে নির্দেশনা দিবেন, তা মেনে সংশ্লিষ্ট সবাইকে চলতে হবে। যদি কেউ এ সত্য অস্বীকার করে, তাহলে অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির নিয়মের উর্ধ্বে সে যেতে পারবে না। ইসলামের নামে জন্ম নেওয়া শত বছরের পুরোনো এ কাজও কাঙ্ক্ষিত প্রজন্ম তৈরি করতে পারবে না। ইসলামের নামে চললেও এ কাজের ফলে তৈরি সমাজটি হয়ে যাবে ইসলামী আখলাক শূন্য। যেভাবে বহু দীনী জামাআত একসময় পথ হারিয়েছে। বড় আশা-আকাঙ্ক্ষার কাজ পরিণত হয়েছে নতুন ফেরকায়। গোমরাহ জামাআতে। মিল মহব্বতের তাবলীগ, ইখলাস ও লিল্লাহিয়াতের তাবলীগ অন্তত বাংলাদেশে যে মতান্তর, বিরোধ, বিদ্বেষ, হানাহানি, রক্তারক্তির নজির স্থাপন করছে, এমন কল্পনাও কি সাধারণ মানুষ করেছিল? এদেশের জনগণ স্বপ্নেও কি ভেবেছিল, দীনদার লোকেরা ওলামায়ে কেরামকে এভাবে দুশমন মনে করবে? তাদের হাতে অপর মুসলমান হতাহত হবে?

দেশব্যাপী দুঃখ ও বেদনার শৈত্যপ্রবাহ বইছে। সারাদেশে উভয় গ্রুপের মনে জ্বলছে তুষের আগুন। তাবলীগী একটি শ্রেণী ও ওলামায়ে কেরামের অনুসারী দীনদার পরহেজগার মানুষের পরস্পরের অন্তরে কল্পনাতীত দ্বিধা-সংশয়, ভয়, শঙ্কা ও অনিশ্চয়তা। এত কিছুর জন্য যারা দায়ী, তাদের কী যে পরিণতি হবে তা নিয়ে আমরা খুবই ভাবিত ও চিন্তিত। শুধু আবেদন রাখতে চাই, সবাই আল্লাহকে ভয় করুন। বিবেক জাগ্রত করুন। সব কিছুর জন্য একদিন প্রত্যেককেই জবাবদিহি করতে হবে।

(দৈনিক ইনকিলাবের সৌজন্যে)

লেখক : বিশিষ্ট আলেমেদীন ও সহ-সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব

মেসার্স রাজিব এন্টারপ্রাইজ

প্রো. হাফেজ মাওলানা রহমাতুল্লাহ

সরাসরি সিলেটের ভোলাগঞ্জ ও জাফলং থেকে গুণগত মানসম্পন্ন
পাথর ও সিলেকশন বালু
সরবরাহের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

এল.সি কালো পাথর
আমদানীকারক

এল.সি. কালো পাথর, সিঙ্গেল, বোল্ডার ভাঙ্গা, ভুতু ভাঙ্গাসহ সর্বপ্রকার নির্ভেজাল ও কোয়ালিফাইড পাথর এবং সিলেকশন বালু সুলভ মূল্যে সারাদেশে সরবরাহ করা হয়।

ঢাকা অফিস
হাউজ # ৩/৩/১৫, রোড # ৪
চাঁনমিয়া হাউজিং, বাঁশবাড়ি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
০১৭১৬৭১০৭১১, ০১৮৭৬০০৩৫১৮

ভোলাগঞ্জ অফিস
শাকুরা পাম্পের দক্ষিণে
কোম্পানীগঞ্জ ভোলাগঞ্জ, সিলেট
০১৮১৬৪৩৮৮১২

রুজু কেন রুজু নয়!

মুফতী সাঈদ আহমাদ দা.বা.

দাওয়াত ও তাবলীগের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এতায়াতীদের পক্ষ হতে প্রচার করা হয় যে, তাবলীগের স্বঘোষিত আমীর মাওলানা সা'দ সাহেব তার বিভিন্ন বয়ানে যেসব বিভ্রান্তিমূলক কথা বলেছেন, সেসব কথা থেকে তিনি বারবার রুজু করেছেন। তা সত্ত্বেও আমাদের দেশের আলেমগণ তার ব্যাপারে বিষোদ্গার করে থাকেন! এ অভিযোগের প্রেক্ষিতে কয়েকজন সচেতন মুসল্লী আমাদের কাছে নিম্নলিখিত প্রশ্নটি প্রেরণ করেন। এই লেখাটি সেই প্রশ্নের জবাবে প্রস্তুত করা হয়েছে। লেখার শেষে জরুরী সূত্রসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে, যেন কেউ যাচাই করতে আগ্রহী হলে করা সম্ভব হয়।

প্রশ্নঃ আমরা শুনেছি, মাওলানা সাদ সাহেব তার ভুল বুঝতে পেরে আপত্তিকর উক্তিগুলো থেকে দারুল উলূম দেওবন্দের আলেমদের কাছে রুজুনামা প্রেরণ করেছেন। বাস্তবেই কি তিনি তার বক্তব্য রুজু/প্রত্যাহার করেছেন? রুজু করে থাকলে বর্তমানে তার ব্যাপারে দেওবন্দের অবস্থান কী?

باسمه تعالى

حامدا و مصليا و مسلما

الجواب والله الموفق للصواب

দারুল উলূম দেওবন্দের ঘোষিত অবস্থানের প্রেক্ষাপট

মাওলানা সা'দ সাহেবের ব্যাপারে দারুল উলূম দেওবন্দের ফতওয়া প্রকাশ এবং সে প্রেক্ষিতে তাঁর একাধিকবার রুজুর ব্যাপারে দারুল উলূমের অবস্থান জানার আগে জেনে নেয়া দরকার যে, মাওলানা সা'দ সাহেবের শরীয়তবিরোধী কথা ও কাজের ধারা অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে। দারুল উলূম ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম শুরুতেই তার ব্যাপারে ফতওয়া প্রকাশ করে দেননি। সাধারণ জনগণের মধ্যে এর মন্দ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় শুরুতে উলামায়ে কেরাম বিভিন্নভাবে তাঁকে এসব ভুল বক্তব্য প্রদান থেকে বিরত থাকার মৌখিক অনুরোধ ও লিখিত সতর্কবার্তা প্রদান করে আসছিলেন।

এক্ষেত্রে হিন্দুস্তানের উলামায়ে কেরাম কমপক্ষে আট বছর পূর্ব থেকে চেষ্টা করে আসছেন।[১] এ সময়ের মধ্যে ভারতের অভ্যন্তর ও বহির্বিশ্ব থেকে মাওলানা সা'দ সাহেবের ব্যাপারে জানতে চেয়ে অসংখ্য চিঠি দারুল উলূমে পৌঁছেছে। কিন্তু যেহেতু সমস্যাগুলোর সম্পর্ক এমন এক দীনী কাজের সঙ্গে, যার পরিধি সারা দুনিয়ায় বিস্তৃত, সেজন্যে তাঁরা শুরু থেকেই ইতিবাচক ও সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গিতে সংস্কারমূলক কাজ করেছেন। সাধারণ জনগণের সামনে এমন কোন বাক্য উচ্চারণ করা হয়নি, যার দ্বারা দাওয়াতের কাজের সঙ্গে তাদের বিদ্বেষ সৃষ্টি হতে পারে।

প্রায় আট বছর পূর্বে[২] কানপুরের উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে সা'দ সাহেবের বক্তব্যের বিশদ বিবরণ সম্বলিত একটি ফতওয়ার আবেদন দারুল উলূম দেওবন্দে পৌঁছে। সে সময়েও দারুল উলূম এ ফতওয়ার জবাব ইতিবাচকভাবে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে বছরই দারুল উলূমে নিযামুদ্দীনের প্রতিনিধিদল আগমন করলে তাঁদের সামনে দারুল উলূমের উস্তাদগণ মাওলানা সা'দ সাহেবের ব্যাপারে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন এবং সা'দ সাহেব সমীপে একটি সংক্ষিপ্ত চিঠি প্রেরণ করেন। কিন্তু দারুল উলূমের এ খায়েরখাহী ও হিতাকাঙ্ক্ষাকে প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে তাবলীগবিরোধিতা আখ্যা দেয়া হয় এবং সে চিঠির জবাবে দারুল উলূমের উদ্বেগ নিরসন করার পরিবর্তে দারুল উলূমের প্রেরিত চিঠির কিছু অর্থহীন প্রশংসা করে নিযামুদ্দীনের অবদানের বিরাট ফিরিস্তি তুলে ধরা হয়।[৩] এ কারণে তখন দারুল উলূমের এ ইসলাহী প্রচেষ্টা বাহ্যত নিষ্ফল হয়ে যায়।

সংশোধন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে দারুল উলূম দেওবন্দ গত ৩১ আগস্ট ২০১৫ তারিখেও নিযামুদ্দীনের পুরনো সাথীদের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি প্রেরণ করেন। কিন্তু নিযামুদ্দীন থেকে সেটার কোন জবাব আসেনি।[৪]

প্রায় ছয় বছর আগে ১৪৩৪ হিজরীতে হাতুরাবান্ধায় অনুষ্ঠিত ইজতেমায় বাদ মাগরিবের বয়ানে মাওলানা যায়েদ মাযাহেরী নদবী উপস্থিত থেকে মাওলানা সা'দ সাহেবের বয়ান শোনেন ও লিপিবদ্ধ করেন। সেখানেও মাওলানা সা'দ সাহেব অনেক বিতর্কিত বক্তব্য প্রদান করেন। মাওলানা যায়েদ মাযাহেরী সাহেব দা.বা. সেসব বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে সা'দ সাহেবের শ্বশুর মাওলানা সালমান সাহেব মাযাহেরী দা.বা.-এর কাছে অর্পণ করেন। তিনি সেটা সম্পূর্ণ পাঠ করে সা'দ সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেয়ার আদেশ করেন। কিন্তু মাওলানা যায়েদ সাহেব তাড়াহুড়ো না করে সে লেখা মাওলানা আবুল কাসেম নুমানী, মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী, (পরবর্তীতে) মাওলানা সায়্যেদ মুহাম্মদ রাবে' হাসানী-সহ

---

১. দারুল উলূম দেওবন্দে দাওরা ও ইফতাসহ দীর্ঘ নয় বছর অধ্যয়নকারী মাওলানা খিযির মাহমুদ কাসেমী লিখিত, *حضرت مولانا سعد صاحب مد ظلہ سے متعلق دار العلوم دیوبند کے موقف اور فتوی کا پس منظر* নামক রিসালা, পৃষ্ঠাঃ ১৬, বাংলা অনুবাদে পৃষ্ঠা:১৮, অনুবাদ হয়েছে 'সাআদ সাহেবের বিচ্যুতি নিরসনে দারুল উলূম দেওবন্দের উদ্যোগ, কিছু বেদনা, কিছু ইতিহাস' নামে। অনুবাদক : মাওলানা আব্দুল্লাহ আল ফারুক। প্রকাশক : মাকতাবাতুল আযহার।

২. মাওলানা খিযির মাহমুদ কাসেমী সাহেব তখন দারুল উলূমে ইফতা বিভাগে অধ্যয়নরত। আর তিনি ফারেগ হয়েছেন ২০১১ ঈসায়ীতে। সে হিসাবে এ ঘটনাও কমপক্ষে ৮বছর আগের। দেখুন, 'সাআদ সাহেবের বিচ্যুতি নিরসনে দারুল উলূম দেওবন্দের উদ্যোগ, কিছু বেদনা, কিছু ইতিহাস', পৃষ্ঠা ১৮

৩. মাওলানা খিযির মাহমুদ কাসেমী লিখিত, *حضرت مولانا سعد صاحب مد ظلہ سے متعلق دار العلوم دیوبند کے موقف اور فتوی کا پس منظر* নামক রিসালা, পৃষ্ঠাঃ ১৭-১৮, বাংলা অনুবাদে পৃষ্ঠা:১৯-২০।

৪. (ক) ড. আফতাব আলম লিখিত, *دعوت تبلیغ کے نہج کی حفاظت کے لیے اکابرین کے موقف اور انکی اصلاحی کوششوں پر مشتمل مجموعہ خطوط* বাংলা অনুবাদ, 'তাবলীগের চলমান সংকট নিরসনে আকাবির উলামা ও মুরব্বীদের দিকনির্দেশনা' পৃষ্ঠাঃ ৬৯, অনুবাদক: মাওলানা আব্দুল্লাহ আল ফারুক, প্রকাশক: মাকতাবাতুল আসাদ, আশুলিয়া,ঢাকা।

(খ) দারুল উলূম দেওবন্দের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত দ্রষ্টব্য।

অন্যান্য উলামায়ে কেরামকেও দেখান। তাঁরা সবাই এ লেখার সাথে শতভাগ একমত পোষণ করেন। এরপর মাওলানা যায়েদ সাহেব সে লেখা নিয়ে নিজেই নিযামুদ্দীন মারকাযে উপস্থিত হয়ে মাওলানা সা'দ সাহেবের হাতে তা পেশ করেন। মাওলানা সা'দ সাহেব সেটা হাতে নিয়ে কোনোরকম উল্টে-পাল্টে দেখে সে লেখায় আরোপিত আপত্তিগুলোর মধ্য থেকে কোনটার ব্যাপারে বললেন, 'এটা তো আমি বলিনি।' আর কোনটার ব্যাপারে বললেন, 'অমুক কিতাবে এমন লেখা আছে।' মোটকথা, মাওলানা যায়েদ মাযাহেরী দা.বা.-এর সে উদ্যোগও তার মধ্যে বাহ্যত কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি।[১]

এরপর লাহারপুর-সিতাপুরের ইজতেমাতেও মাওলানা সা'দ সাহেব অসংখ্য আপত্তিকর বক্তব্য প্রদান করেন। মাওলানা যায়েদ মাযাহেরী সাহেব সেসব বয়ান মনোযোগ দিয়ে শুনে লিপিবদ্ধ করে মাওলানা সায়্যেদ মুহাম্মদ রাবে' হাসানী সাহেবকে দেখান। তিনি বলেন,

واقعی ان کی بعض باتیں مسلک جمہور سے ہٹی ہوئی ہیں، ان کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے

অর্থ : 'বাস্তবেই তাঁর কোন কোন কথা জমহুরের নীতি বহির্ভূত। তাঁকে সতর্ক করা প্রয়োজন।' এরপর মাওলানা যায়েদ সাহেব সে লেখাও মাওলানা সা'দ সাহেব সমীপে পেশ করেন। কিন্তু সেটাও পূর্বের মতো নিষ্ফল হয়।

উলামায়ে কেরামের ইসলাহী প্রচেষ্টার পাশাপাশি তাবলীগের একান্ত মুরুব্বীরাও অনেক আগে থেকে মাওলানা সা'দ সাহেবকে এসব বক্তব্যের ব্যাপারে সতর্ক করে আসছিলেন। সা'দ সাহেবের উস্তাদ মাওলানা ইবরাহীম দেউলা সাহেব দা.বা. তাঁর লেখা ১৫ আগস্ট ২০১৬-র চিঠিতে বলেন,

'দাওয়াতের মেহনতে শুরু থেকেই বয়ানের ক্ষেত্রে সতর্ক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। অনির্ভরযোগ্য কথা, ইজতিহাদ ও ভুল দলিল থেকে পুরোপুরি সুরক্ষিত থাকার চেষ্টা করা হয়েছে। এজন্যই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ বয়ান ছয় সিফাতের ভেতর রাখবে। কোন আয়াত বা হাদীসের ব্যাখ্যা করতে হলে অবশ্যই নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কিরামের সূত্রে বলতে হবে। ... কিন্তু বর্তমান সময়ে কাজের অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিম্মাদারগণ এতদিনের সীমারেখা ত্যাগ করছেন। বিশেষ করে সাহাবায়ে কিরামের জীবন থেকে ভুলভাবে দলীল দেয়া হচ্ছে। প্রায় সময় দীনের বিভিন্ন সংগঠন ও ঘরানার সমালোচনা করা হচ্ছে। এসব কর্মকাণ্ডের উপর আমি শুরু থেকেই সন্তুষ্ট ছিলাম না। এবিষয়ে অসংখ্যবার তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি। আমার বয়ানেও ইতিবাচকভাবে সতর্ক করার চেষ্টা করে এসেছি। কিন্তু যখন বিষয়টি সীমা ছাড়িয়ে গেলো...'।[২]

মাওলানা ইবরাহীম দেউলা সাহেবের বক্তব্যে স্পষ্ট যে, মাওলানা সা'দ সাহেবের ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে।

শুধু মাওলানা ইবরাহীম দেউলা সাহেবেই নন; বরং এ মেহনতের সাথে মাওলানা সা'দ সাহেবেরও অনেক আগ থেকে জড়িত আলেম ও মুরুব্বীগণও বিভিন্ন সময়ে চিঠি পাঠিয়ে এবং সরাসরি তাঁকে সতর্ক করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মধ্যে মাওলানা আহমাদ লাট সাহেব, মাওলানা ইয়াকুব সাহেব রহ., মাওলানা ইসমাঈল গোধরা, ভাই আব্দুল ওয়াহহাব রহ., ড. খালিদ সিদ্দীকী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৩]

কিন্তু তাঁদের সম্মিলিত সংশোধনী প্রচেষ্টার পর মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত এক মজমায় জনসাধারণের সামনে মাওলানা সা'দ সাহেব বলেন,

کچھ لوگ مجھ سے مناظرہ کرنے آئے تھے اور اپنے تجربہ بتارہے تھے، حالانکہ کام تجربہ کا نہیں ہے بلکہ سیرت کا ہے۔

অর্থ : 'কিছু মানুষ আমার সাথে তর্ক করতে এসে নিজেদের অভিজ্ঞতা বলছে। অথচ এই কাজ অভিজ্ঞতার আলোকে নয়, সীরাতের আলাকে করতে হয়।'

তিনি আরো বলেন,

مجھ سے کہتے ہے کہ مشورہ نہیں کرتا، میں مشورہ کس سے کروں؟ کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتا۔

অর্থ : 'আমাকে বলে, আমি নাকি পরামর্শ করি না। পরামর্শ কার সাথে করব, কেউ তো কাজই করতে চায় না?'

সারকথা : মাওলানা সা'দ সাহেবের বিষয়ে উত্থিত আপত্তিগুলো জনসম্মুখে আসার অনেক আগে থেকেই তাঁকে সংশোধনের বিভিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এই প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে দারুল উলূম দেওবন্দ, নদওয়াতুল উলামা, মাযাহেরুল উলূম-সহ অন্যান্য বড় বড় প্রতিষ্ঠানের উলামায়ে কেরাম এবং তাবলীগের আকাবির উলামায়ে কেরাম ও মুরুব্বী সবাই শামিল ছিলেন। কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

দারুল উলূম দেওবন্দ ঘোষিত অবস্থান ও সা'দ সাহেবের রুজুর বাস্তবতা

রুজু শব্দের শাব্দিক অর্থ ফিরে আসা। দীনি বিষয়ে কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়ে গেলে রুজু করার অর্থ হলো, কয়েকটি শর্তের সাথে সহীহ বিষয়ের দিকে ফিরে আসা। শর্তগুলো এই–

১. যদি ভুলটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে রুজু করা। আর ভুলটা প্রকাশ্যে সংঘটিত হলে প্রকাশ্যে রুজু করা।[৪]

২. অনুতপ্ত হয়ে খাঁটি দিলে তওবা করা।

৩. পরবর্তীতে সে ভুল আর না করার প্রতিজ্ঞা করা।

সুতরাং সা'দ সাহেবের রুজু গ্রহণযোগ্য কিনা তা বুঝতে হলে দেখতে হবে, তাঁর রুজুর মধ্যে এসব শর্ত পাওয়া গিয়েছিলো কিনা?

সা'দ সাহেবের আপত্তিকর বয়ানের ব্যাপারে জনসাধারণকে সতর্ক করার লক্ষ্যে দারুল উলূম দেওবন্দ **২২** সফর **১৪৩৮** হিজরী মোতাবেক **২৩ নভেম্বর ২০১৬** ঈসায়ী সনে মুত্তাফাকাহ মাওকিফ বা **সর্বসম্মত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তপত্র** তৈরি করে নিজেদের অবস্থান ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর সাতদিন পর **২৮** সফর মোতাবেক **২৯** নভেম্বর সা'দ সাহেবের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদল দারুল উলূম দেওবন্দে আগমন করেন এবং সা'দ সাহেব আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামা'আতের খেলাফ বয়ান থেকে রুজু করতে প্রস্তুত আছেন– এ মর্মে দারুল উলূম কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলে দেওবন্দ কর্তৃপক্ষ মুত্তাফাকাহ মাওকিফ জনসম্মুখে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন এবং মুত্তাফাকাহ মাওকিফ

---

১. মাওলানা যায়েদ মাযাহেরী নদবী লিখিত, انکشاف حقیقت , পৃষ্ঠা: ৫

২. মাওলানা যায়েদ মাযাহেরী নদবী লিখিত, انکشاف حقیقت, পৃষ্ঠা: ৭-৯

৩. ড. আফতাব আলম লিখিত, دعوت تبلیغ کے نہج کی حفاظت کے لیے اکابرین کے موقف اور انکی اصلاحی کوششوں پر مشتمل مجموعہ خطوط কিতাবের ৩৫ থেকে ১৫২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সে সকল চিঠি সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কিতাব মাওলানা আব্দুল্লাহ আল ফারুক কর্তৃক 'তাবলীগের চলমান সংকট নিরসনে আকাবির উলামা ও মুরব্বীদের দিকনের্দেশনা' নামে বাংলায় অনুবাদ হয়ে মাকতাবাতুল আসআদ, আশুলিয়া, ঢাকা থেকে প্রকাশ পেয়েছে।

৪. এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,
عن معاذ قال: قلت: يا رسول الله، أوصني، فقال: عليك بتقوى الله ما استطعت، واذكر الله عند كل حجر وشجر، وما عملت من سوء فأحدث لله فيه توبة : السر بالسر، والعلانية بالعلانية. (المعجم الكبير للطبراني: ٣٣١)

(সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত)-র একটি কপি সা'দ সাহেব সমীপে প্রেরণ করা হয়।[১]

পরদিন **৩০ শে নভেম্বর** সা'দ সাহেবের **১ম রুজুসংবলিত চিঠি** মাদ্‌রাসা মাযাহেরুল উলূম সাহরানপুরের হাদীস বিভাগের উস্তাদ মাওলানা আব্দুল আযীম সাহেব দেওবন্দ কর্তৃপক্ষের হাতে সোপর্দ করেন। কিন্তু দারুল উলূমের কাছে সে রুজুনামা গ্রহণযোগ্য হয়নি। কারণ, **১**ম রুজুনামার শুরুর দিকে যদিও তিনি রুজু করার কথা বলেছেন, কিন্তু শেষে তিনি যা লিখেছেন তার সারকথা হলো, 'আপনারা আমার বিষয়ে যা লিখেছেন, বদগুমানী করে লিখেছেন; আমার বক্তব্যের রেফারেন্স আগামীতে আপনাদের কাছে পাঠাবো।' মাওলানা সা'দ সাহেবের এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, তিনি তার ভুল বুঝতে পারেননি। অথবা বুঝতে পারলেও স্বীকার করেননি এবং নিজের বক্তব্য প্রত্যাহারও করেননি। সুতরাং এ রুজু গ্রহণযোগ্য নয়।

এরপর দেওবন্দ থেকে মাওলানা সা'দ সাহেবের ব্যাপারে তাদের সর্বসম্মত অবস্থান প্রকাশ করে দেয়া হয়।[২] সেখানে তারা বলেন, তাহকীকের মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, মাওলানা সা'দ সাহেবের বয়ানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পাওয়া যায়–

১. কুরআন-হাদীসের ভুল অথবা অনির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা।
২. দলীলের অপপ্রয়োগ।
৩. তাফসীর বির-রায়।
৪. হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা।
৫. নবীগণের শানে বেয়াদবী।
৬. সর্বসম্মত ফতওয়ার বিরুদ্ধাচরণ।
৭. দীনের অন্যান্য মেহনতকে হেয় করা, ইত্যাদি।

তাঁর এ সকল কাজ থেকে মনে হচ্ছে, তিনি জমহুর উলামায়ে কেরামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে পড়ছেন। ... এ লেখার শেষে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় যে, সা'দ সাহেবের যেসব ভুল চিন্তাধারা জনগণের মধ্যে ইতোমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, সেগুলো সংশোধনের পূর্ণ প্রচেষ্টা করতে হবে। যদি সা'দ সাহেবকে এখনই বাধা না দেয়া হয়, তাহলে ভবিষ্যতে তাবলীগের সাথে সম্পৃক্ত উম্মতের একটি বড় অংশ গোমরাহীর শিকার হয়ে ভ্রান্ত দলে পরিণত হতে পারে!

এরপর মাওলানা সা'দ সাহেব **১১** রবিউল আউয়াল **১৪৩৮** হিজরী রবিবার মোতাবেক **১১ ডিসেম্বর ২০১৬** ঈসায়ী তারিখে মাওলানা নূরুল হাসান কান্ধলবী ও তার সাথীদের মাধ্যমে তার **২য় রুজুনামা** পাঠান। সেখানে তার দস্তখত ছিলো ১০ রবিউল আউয়ালের। সে রুজুনামা ছিলো হুবহু আগের রুজুনামা। শুধু সেখান থেকে বদগুমানীর অভিযোগ এবং রেফারেন্স পাঠানোর বিষয়টি মুছে ফেলা হয়েছিলো।

যেহেতু সে রুজুনামায় বাহ্যিকভাবে কোন আপত্তিকর বিষয় ছিলো না, সেজন্যে দারুল উলূমের উস্তাদগণ সেটাকে কবুল করে নিয়ে তৎক্ষণাৎ একটি প্রাপ্তিস্বীকারপত্র দেন। এ প্রাপ্তিস্বীকারপত্রে তারা 'স্পষ্ট শব্দে রুজুর জন্য' মাওলানা সা'দ সাহেবের শুকরিয়া আদায় করেন এবং বলেন যে, ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত পত্র পরবর্তীতে দেয়া হবে।

বিষয়টা এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারতো। ওয়াদামাফিক মাওলানা সা'দ সাহেবের উল্লিখিত রুজুর উপর আস্থা প্রকাশ করে দারুল উলূম কর্তৃপক্ষ একটি বিস্তারিত চিঠি তৈরিও করে ফেলেছিলেন। সেখানে তারা বলেছিলেন যে, 'মাওলানা সা'দ সাহেবের যেসব আপত্তিকর বক্তব্যের ব্যাপারে দারুল উলূম দেওবন্দ নিজেদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছিলো, সেটা তার জায়গায় ঠিক আছে।... সেখানে যেসব ফিকিরের কথা বলা হয়েছিলো, দারুল উলূম এখনো সেগুলোকে ভুল ও অগ্রহণযোগ্যই মনে করে। ... কিন্তু এখন যেহেতু মাওলানা সা'দ সাহেব স্পষ্টভাবে সেসব বক্তব্য থেকে রুজু করে উলামায়ে দেওবন্দের মাসলাককে নিজের মাসলাক বলে ঘোষণা করেছেন, সে কারণে এখন আর মাওলানাকে সেসব বয়ানের দিকে সম্পৃক্ত করা ঠিক হবে না।'[৩]

১৩ রবিউল আউয়াল **১৪৩৮** হিজরী মঙ্গলবার মোতাবেক **১৩**ই ডিসেম্বর **২০১৬** ঈসায়ী তারিখে এ পত্র তৈরি করে দু'জন বাহককে দিয়ে নিযামুদ্দীন রওয়ানা করিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু পত্রবাহকদ্বয় নিযামুদ্দীন পৌঁছার আগেই সা'দ সাহেব রুজুর শর্ত ভেঙ্গে ফেলেন। সেদিন সকালেই তিনি আবার সেই ধরনের বক্তব্যই প্রদান করেন; যেগুলো থেকে তিনি রুজু করেছিলেন।[৪] দারুল উলূম কর্তৃপক্ষ এ সংবাদ যাচাইয়ের সাথে সাথে পত্রবাহকদ্বয়কে ফেরৎ তলব করে নেন। রুজুর শর্তবিরোধী কাজ করার কারণেই মাওলানা সা'দ সাহেবের দ্বিতীয় রুজুনামাটিও প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়।

এরপর মাওলানা সা'দ সাহেব ১০ রবিউস সানী ১৪৩৮ হিজরী মোতাবেক **৯ই জানুয়ারী ২০১৭ ঈসায়ী** তারিখে তাঁর **তৃতীয় রুজুনামা পাঠান**। সেখানে তিনি কিছু বিষয়ে নিঃশর্ত রুজু করলেও হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনার ব্যাপারে বলেন, 'আমি যেটা বলেছি সেটা তো অমুক অমুক তাফসীর থেকে বুঝে আসে।' তিনি সেখানে বুঝাতে চান যে, আমি এ বিষয়ে যা বলেছি, তা বাতিল নয় বরং মারজুহ বা তুলনামূলক দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা। তারপরও আমি রুজু করছি।

এ আপত্তিটা ছিলো তাঁর উপর আরোপিত আপত্তিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক। এখানে এসেই তিনি রুজুর শর্তের দিকে লক্ষ্য রাখতে পারেননি। কারণ রুজু করতে হলে তাকে তো আগে ভুল স্বীকার করতে হবে। তিনি তো ভুল স্বীকার করতেই নারাজ। নিজের কথাকে বাতিল না বলে মারজুহ দাবী করছেন। সুতরাং তৃতীয় রুজুনামার গ্রহণযোগ্যতাও হারালো।

পরে দারুল উলূম দেওবন্দ ২৪ রবিউস সানী ১৪৩৮ হিজরী মোতাবেক ২৮ জানুয়ারী ২০১৭ ঈসায়ী তারিখে সা'দ সাহেবের গলদ বিষয়গুলোর স্বপক্ষে পেশকৃত দলীলসমূহের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় এবং হযরত মূসা আ.-এর ব্যাপারে কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই সে ভুল থেকে পুনরায় রুজু করতে বলা হয়।[৫] সেই সাথে দেওবন্দের পক্ষ থেকে এটাও বলা হয় যে, (যেহেতু এ কথা আপনি বলেছেন জনতার সামনে; সেহেতু রুজুর নিয়ম

---

১. ০৫-০৩-৩৮ হিজরীতে দেওবন্দের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত 'জরুরী ওয়াযাহাত' দ্রষ্টব্য।

২. ২২,২৩, ২৭ ও ২৮ সফর ১৪৩৮ হিজরীতে স্বাক্ষরকৃত দারুল উলূমের প্যাডে লিখিত সে চিঠির সূত্র: ৯৬/৩।

৩. মাওলানা যায়েদ মাযাহেরী নদবী লিখিত, انکشاف حقیقت , পৃষ্ঠা: ১৭-১৮।

৪. ১৩ ডিসেম্বর ২০১৬ ঈসায়ী তারিখ সকালে নিযামুদ্দীনে মাওলানা সা'দ সাহেব যে বক্তব্য প্রদান করেছেন, তার উল্লেখযোগ্য অংশ হলো–(আল কাউসার: ডিসেম্বর ২০১৮, পৃষ্ঠা: ১৬)
دعوت کا چھوٹ جانا یہ امت کی گمراہی کا یقینی سبب ہے۔۔۔میں یہ سمجھ کر کہہ رہا ہوں صرف ۴۰ رات موسی علیہ السلام دعوت کا عمل نہیں کیا، ۴۰ رات موسی علیہ السلام عبادت میں مشغول رہے اور اس ۴۰ رات کے عرصہ میں ۵ لاکھ ۸۸ ہزار بنی اسرائیل سب کے سب بچھڑے کی عبادت پر جمع ہو گئے۔

৫. দারুল উলুমের প্যাডে লিখিত সে চিঠির সূত্র: ১৯৩/$\frac{৩}{১}$।

অনুযায়ী জনতার সামনেই) আপনাকে রুজু করতে হবে।[১]

কিন্তু রুজুর এ শর্ত না মেনেই সা'দ সাহেব এরপর ৪ জুমাদাল উলা ১৪৩৮ হিজরী মোতাবেক **২রা ফেব্রুয়ারী ২০১৭** ঈসায়ী তারিখে তাঁর **৪র্থ রুজুনামা** পাঠান। সেখানে তিনি নিঃশর্তভাবে রুজু করার কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু যেহেতু শর্ত ছিলো প্রকাশ্যে রুজু করবেন। তা না করে শুধু কাগুজে রুজু করেছেন।[২] এ কারণে **দারুল উলূমের মুহতামিম সাহেব দা. বা.** এ রুজুনামা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

সা'দ সাহেবের মৌখিক রুজু

মাওলানা সা'দ সাহেবের চারটি লিখিত রুজুনামার বাস্তবতা বোঝার পর আমরা তার মৌখিক দু'টি রুজুর অবস্থা সম্পর্কে জানব।

মৌখিকভাবে তার একটি রুজু পাওয়া যায় যাকে ৫ম রুজু বলা যায়। ২ ডিসেম্বর ২০১৭ ঈসায়ী তারিখে নিযামুদ্দীনের মসজিদে বা'দ ইশার বয়ানে তিনি এ রুজু করেন। কিন্তু এটা তো স্পষ্ট যে, এই রুজু শর্ত মোতাবেক হয়নি। কারণ, তিনি ভুল কথাগুলো বলেছেন লাখো মানুষের মজমায় এবং তার সে বয়ান শুনে সাধারণ সাথীদের অনেকে সেই বিভ্রান্তিমূলক কথাগুলো নিজেদের বয়ানে বলতে শুরু করে দিয়েছে; কাজেই চারদেয়ালের ভেতর গুঁটিকয়েক লোকের সামনে বসে রুজু করলে কী লাভ হবে? অথচ এরপর তিনি আওরঙ্গবাদের ইজতেমাসহ আরো কয়েকটি ইজতেমায় শরীক হয়েছেন, তার জন্য এসব মজমায় রুজু করার সুযোগ ছিল, কিন্তু তিনি এসব মজমায় রুজু করেননি।

এরপর ২০১৮-র টঙ্গী ইজতেমা চলাকালীন শুক্রবার কাকরাইল মসজিদে আরেকবার তিনি রুজু করেন, যাকে ৬ষ্ঠ রুজু বলা যায়। কিন্তু সে রুজুও ছিলো মসজিদের ভেতর কিছুসংখ্যক মানুষের সামনে। তদুপরি সে রুজুতে তাঁর একটি বাক্য ছিলো, 'যদি আমার কোন কথায় আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাআত থেকে বিচ্যুতি ঘটে থাকে, তাহলে তা থেকে রুজু করা উচিৎ।' দেখুন, একে তো তিনি মানতে চাইছেন না যে, তার বক্তব্যে এমন কথা আছে এবং এজন্যই তিনি 'যদি' শব্দ ব্যবহার করছেন। দ্বিতীয়ত বলছেন যে, 'রুজু করে নেয়া উচিৎ'। তার এই বক্তব্য দ্বারা তো তিনি সেই উচিৎ কাজটি সম্পাদন করলেন কিনা, তা কিন্তু বোঝা গেল না।[৩]

একদিকে তিনি বারবার বিভিন্নভাবে বাহ্যত রুজু করছেন। অন্যদিকে তাঁর অনুসারীরা তাঁর ভুল বক্তব্যগুলোর কিছু বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত রেফারেন্স বের করে সেগুলো সঠিক প্রমাণ করার জন্য (ভারত ও বাংলাদেশে) বইপত্র লিখছে ও প্রচার করছে। এখান থেকেও তাঁর রুজুর বাস্তবতা বুঝে আসে।

রুজুর ব্যাপারে সারকথা

শর্তমাফিক রুজু না করার কারণে সা'দ সাহেবের চারটি লিখিত ও দুটি মৌখিক রুজুর কোনটিই দারুল উলূমের উলামায়ে কেরাম-সহ অন্যান্য আলেমদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। সা'দ সাহেবের সে ছয়টি রুজুর বাস্তবতা সবার সামনে রয়েছে। এছাড়াও তাঁর সেসব রুজুতে মাত্র কয়েকটি ভুল বক্তব্যের উল্লেখ আছে। এসব বক্তব্য ছাড়াও তাঁর অসংখ্য বক্তব্য এমন রয়েছে যেগুলো থেকে তিনি এখনো নামকাওয়াস্তে হলেও লিখিত বা মৌখিক কোনপ্রকার রুজুই করেননি। বরং কথিত রুজুনামার পরেও ঐ জাতীয় ভুল বক্তব্য ও উক্তি করেই চলেছেন, যা উম্মতের সঠিক চিন্তা-চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও চরম বিভ্রান্তিমূলক। উদাহরণত ২০১৮ সালের বিভিন্ন বয়ানে যেসব বিভ্রান্তিমূলক বয়ান করেছেন সেগুলোর স্থান-সময় ও অডিও রেফারেন্সসহ স্বতন্ত্র বই সচেতন মহলের নিকট বিদ্যমান আছে।

সা'দ সাহেবের ব্যাপারে দারুল উলূমের বর্তমান অবস্থান

দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে গত ৩১ জানুয়ারী ২০১৮ ঈসায়ী তারিখে 'এক জরুরী ওয়াযাহাত'নামা প্রকাশ করা হয়। সেখানে বলা হয়,[৪]

'এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট করা জরুরী। সেটা হলো, এই (মূসা আ.-এর) ঘটনার বিষয়ে তো মাওলানা (সা'দ সাহেবে)-র রুজুকে সন্তোষজনক বলে মেনে নেয়া যায়, কিন্তু তাঁর চিন্তাগত বিচ্যুতির ব্যাপারে দারুল উলূমের পক্ষ থেকে যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিলো, সে আশঙ্কা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, কয়েকবার রুজুর পরও কিছুদিন পরপর তার এমন কিছু নতুন বয়ান আমাদের কাছে পৌঁছছে, যেগুলোর মধ্যে আগের সেই পাণ্ডিত্যপূর্ণ আন্দায, ভুল প্রমাণপদ্ধতি এবং দাওয়াতের ব্যাপারে নিজস্ব-দৃষ্টিভঙ্গি প্রমাণের জন্য শরীয়তের বাণীসমূহের অপপ্রয়োগের চেষ্টা বিদ্যমান। এই কারণে শুধু দারুল উলূমের দায়িত্বশীলগণই নন, বরং অন্যান্য হক্কানী উলামায়ে কেরামদের মাঝেও মাওলানা (সা'দ) সাহেবের 'সামগ্রিক চিন্তার' ব্যাপারে প্রচণ্ড রকমের অনাস্থা রয়েছে।

মাওলানা (সাআদ) সাহেবের এই অনর্থক ইজতিহাদ দেখে মনে হয়, আল্লাহ না করুন, তিনি এমন এক নতুন দল তৈরির চেষ্টা করছেন, যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বিশেষ করে নিজেদের আকাবিরদের থেকে ভিন্ন রকমের হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে আকাবির ও পূর্বসুরীদের পথ ও পদ্ধতির উপর অটল রাখুন। আমীন।'

দারুল উলূমের এ বক্তব্যে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়–

১. মূসা আ.-এর ঘটনার বিষয়ে মাওলানা সা'দ সাহেবের রুজুকে সন্তোষজনক বলে মেনে নেয়া যায়। অর্থাৎ আসলে পুরো ইতমিনান ও প্রশান্তিযোগ্য নয়, কিন্তু উনি যেহেতু বারবার বলছেন সেজন্য মেনে নেয়া যেতে পারে।

২. তাঁর চিন্তাগত বিচ্যুতির ব্যাপারে দারুল উলূমের আশঙ্কা এখনো বহাল আছে।

৩. এই কারণে অন্যান্য হক্কানী উলামায়ে কেরামের মধ্যেও মাওলানা সা'দ সাহেবের 'সামগ্রিক চিন্তার' ব্যাপারে প্রচণ্ড রকম অনাস্থা রয়েছে।

---

১. ২৪ রবিউস সানী ১৪৩৮ হিজরী মোতাবেক ২৮শে জানুয়ারী ২০১৭ ইং তারিখে দারুল উলূমের প্যাডে লিখিত সে চিঠির সূত্র: ১৯৩/-।

২. ২৫-১২-২০১৭ ঈসায়ী তারিখে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের কাছে দেয়া চিঠিতেও এ শর্তের উল্লেখ রয়েছে। انکشاف حقیقت পৃষ্ঠা: ২৩-২৪।

৩. এ বিষয়ে মাওলানা আরশাদ মাদানীর বক্তব্য দ্রষ্টব্য। মাওলানা যায়েদ মাযাহেরী নদবী লিখিত, انکشاف حقیقت পৃষ্ঠা: ২৬।

৪. দারুল উলূমের প্যাডে লিখিত সে চিঠির সূত্র:২/৩, মূল উর্দূ নিম্নরূপ-

اس موقع سے یہ وضاحت ضروری ہے کہ مولانا کے رجوع کو اس واقعے کی حد تک تو قابل اطمینان قرار دیا جا سکتا ہے! لیکن دارالعلوم کے موقف میں اصلا مولانا کی جس فکری بے راہ روی پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا؛ اس لئے کہ کئی بار رجوع کے بعد بھی وقتا فوقتا مولانا کے ایسے نئے بیانات موصول ہو رہے ہیں، جن میں وہی مجتہدانہ انداز، غلط استدلالات، اور دعوت سے متعلق اپنی ایک مخصوص فکر پر نصوص شرعیہ کا غلط انطباق نمایاں ہے، جس کی وجہ سے خدام دارالعلوم ہی نہیں؛ بلکہ دیگر علمائے حق کو بھی مولانا کی مجموعی فکر سے سخت قسم کی بے اطمینانی ہے۔

... مولانا موصوف کی ان دوراز کار اجتہادات سے ایسا لگتا ہے کہ خدانخواستہ وہ ایسی جدید جماعت کی تشکیل کے درپے ہیں جو اہل السنہ والجماعت اور خاص طور پر اپنے اکابر سے مختلف ہو گی، اللہ تعالی ہم سب کو اکابر و اسلاف کے طریق پر ثابت قدم رکھے، آمین۔

৪. সা'দ সাহেবের অনর্থক ইজতেহাদ দেখে তাঁর ব্যাপারে আশংকা হচ্ছে যে, তিনি 'আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাআত'-এর পরিপন্থী একটি বাতিল ফেরকা তৈরির চেষ্টা করছেন।

শেষকথা

একটা হল সঠিক রাস্তায় থেকে ভুল করা। এ ভুলের সংশোধন রুজুর মাধ্যমে সম্ভব। পথ চলতে গিয়ে হোঁচট খেলে উঠে ধুলোবালি ঝেড়ে আবার সে পথেই চলা শুরু করা সম্ভব। আরেকটা হলো 'ফিকরী বে-রাহরাবী' অর্থাৎ চিন্তাগত বিপথগামিতা। এ ভুলের সংশোধন শুধু রুজুর মাধ্যমে সম্ভব নয়। কেউ যদি নিজের পথই পরিবর্তন করে ফেলে, তাহলে শুধু ধুলোবালি ঝেড়ে সঠিক পথ পাওয়া সম্ভব নয়। সঠিক পথ পেতে হলে তাকে আগের পথে ফিরে আসতে হবে।

দারুল উলূমের বক্তব্য অনুযায়ী মূল সমস্যা হল, তাঁর চিন্তাগত বিপথগামিতা। সেকারণেই রুজুর পরও অসংখ্য মজলিসে তিনি একের পর এক আপত্তিকর বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন। আগের বক্তব্যগুলোর সাথে যোগ হচ্ছে নতুন নতুন বিভ্রান্তিকর বক্তব্য। সুতরাং শুধু রুজু করলেই তাঁর ভুলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে না। সেটা বন্ধ করতে হলে তাকে চিন্তাগত ভিন্নতা পরিহার করে আহলে সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতের চিন্তা-চেতনার পথে ফিরে আসতে হবে। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক : নায়েবে মুফতী, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

(২ পৃষ্ঠার পর; সম্পাদকীয়)

এ মাহফিলে প্রেসিডেন্টকে প্রধান অতিথি আর শিক্ষামন্ত্রীকে বিশেষ অতিথি করে সরকারকে শোকরিয়া জ্ঞাপন করলে কী এমন অসুবিধা হতো!? যারা এতটুকু আত্মসম্মানবোধ বজায় রাখতে অক্ষম তারা রাজনীতি করে ইসলামের ভাবমূর্তি যে কী পরিমাণ উজ্জ্বল করবেন, তা বুঝতে উঁচুমানের বুদ্ধিজীবী হওয়ার দরকার পড়ে না।

(গ) কুরআন-সুন্নাহর সহীহ ধারক-বাহকদের মর্যাদা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক স্বীকৃত এবং প্রকৃত মুসলমানদের কাছেও স্বীকৃত। কাজেই একে আরো মর্যাদাবান করার জন্য অন্য কারো কাছে ধর্না দিতে হবে, এমনটা যে মনে করবে, তার মত বোকা লোক আলেম খেতাব পাওয়ার উপযুক্ত নয়। কোন সরকার যদি এ শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি না দেয় সেটা তার দুর্ভাগ্য, আর কোন সরকার যদি একে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করে তাহলে সেটা তারই একান্ত সৌভাগ্য। জানা কথা যে, দীনী ইলমের যোগ্য ধারক-বাহকের ক্ষেত্রে এ স্বীকৃতির বাড়তি কোন সুফল নেই। পক্ষান্তরে এ স্বীকৃতিতে রয়েছে এ শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে আঘাত হানার নিশ্চিত আশঙ্কা, স্বীকৃতির সূত্র ধরে ভবিষ্যতে শিক্ষা কারিকুলামে অযাচিত হস্তক্ষেপের সমূহ আশঙ্কা, একশ্রেণীর অতি উৎসাহী ও নতজানু প্রকৃতির আলেমদের দ্বারা সে হস্তক্ষেপের পথ সুগম করে দেয়ার প্রবল উদ্বেগ। কাজেই এ ব্যাপারে নড়ে-চড়ে বসতে হবে এখন থেকেই। সকল ছিদ্রপথে শক্ত ও সজাগ পাহারা না বসালে এ স্বীকৃতির পরিণতি যে কী করুণ হবে চিন্তা করলেই গা শিউরে ওঠে।

(ঘ) অসংশ্লিষ্ট পারিপার্শ্বিকতা ও অতিমাত্রায় যন্ত্রনির্ভরতার এ যুগে বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতায় দ্রুত অধঃপতন ঘটছে। ফলে জাগতিক শিক্ষার ধারক-বাহকেরা প্রতিনিয়ত তাদের শিক্ষা কারিকুলামকে আরো সমৃদ্ধ ও আরো ব্যাপক করার সাধনায় লিপ্ত আছেন। পক্ষান্তরে আমাদের দীনী শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি শ্রেণী এখন শর্টকোর্স চালু করার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছেন। শত বছরের পরীক্ষিত কারিকুলামকে যুগ-চাহিদার ভিত্তিতে যেখানে আরো সমৃদ্ধ করে তোলার প্রয়োজন ছিল তার বদলে কাট-ছাঁট করে সেটাকে পঙ্গু বানিয়ে দেয়াই যেন তাদের মিশন। আমাদের বুঝে আসে না, আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্যের দোহাই দিয়ে নেসাব কেন সংক্ষিপ্ত করতে হবে! সংক্ষিপ্ত নেসাবে আরবী ভাষায় দক্ষ করতে হলে সেটা ভাষাশিক্ষা ও জরুরী দীনী শিক্ষা কোর্স হিসেবে চালানো হোক। আলেম বানানোর নেসাবে শর্টকোর্সের প্রয়োজন দেখা দিল কেন? এ শর্টকোর্সের মাধ্যমে জেনারেলকোর্সে অর্ধশিক্ষিত কিছু লোক আলেম নাম ধারণ করার সুযোগ পেয়ে এখন গোমরাহ দলের নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, হাইয়াতুল উলিয়ায় দাওরা পরীক্ষা দিয়ে সরকারী সনদ পাওয়ার ক্ষেত্রে শর্টকোর্সের আলেমরা বয়সসীমা নিয়ে বিপাকে পড়তে যাচ্ছেন। কারণ কেউ কুড়ি বছর বয়সে আলেম হয়ে এম.এ-র সমমান পাবেন এটা সরকার ও জনগণকে মানানো সম্ভব হবে না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এদের দাওরা পরীক্ষার আগে কয়েক বছর তাখাসসুস পড়ে নিতে হবে। অদূরদর্শিতাই এ বিপত্তির কারণ কিনা তা-ও চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন। চলতি সংখ্যা রাবেতায় প্রকাশিত হযরত মাওলানা কারী তায়্যিব সাহেব রহ.-এর সাক্ষাৎকারে নেসাবনামা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরটি গভীর মনযোগ সহকারে পড়া উচিত।

(ঙ) যোগ্যতার গ্রাহ্য ও গ্রহণযোগ্য মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়াই অনেকে আজ মাওলানা, মুফতীর সনদ পেয়ে যায়। দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্ণধারগণের এ ব্যাপারেও নতুন করে ভাবা প্রয়োজন। মাওলানা-মুফতী সনদ লাভের মানদণ্ড কী হওয়া উচিত, কীভাবে সে মানদণ্ড নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং এর জন্য সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক এগুলো সুনির্দিষ্ট থাকা চাই। ঐক্যবদ্ধভাবে সম্ভব না হলেও নিজ নিজ গণ্ডিতে একটা নিয়ন্ত্রণরেখা তৈরি করে নেয়া প্রয়োজন। আজকাল দীনী যে কোন হালকায় প্রচুর পরিমাণে মুফতী ও আলেমের দেখা পাওয়া যায়। ক'দিন আগে এক ভাই এক মুফতী সাহেবের কাহিনী শোনালেন। মুফতী সাহেব নাকি কোন এক ফাক্টরীর নামাযঘরে জুমু'আর খুতবা দিতে মিম্বরে বসে আছেন। তার সামনে খুতবার আযানের পরিবর্তে দুই কানে আঙ্গুল দিয়ে ইকামত দেয়া হলো। অতঃপর মুফতী সাহেব খুতবা দেয়া শুরু করলেন। এবার বলুন! এমন লোকও যদি মুফতী হয়, আর সে যদি হয় 'বাংলার তারিক জামীল'(?) এবং একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের গর্বের মুফতী তাহলে এ সম্প্রদায়ের কী অবস্থা হবে!

আমাদের মতে ছোট পরিসরে তাখাসসুস চালু করা হয়ত দোষণীয় নয়, কিন্তু সেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মানের ব্যাপারে আপোস করা এক ধরনের ইলমী খেয়ানত। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারদের জন্য অবশ্যকর্তব্য হল সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রে স্বীকৃতযোগ্যতার অধিকারী শিক্ষক নিয়োগ দেয়া এবং প্রথম স্তরের যোগ্যতাসম্পন্ন আগ্রহীদেরকেই শিক্ষার্থী হওয়ার সুযোগ দেয়া। আর কোর্স শেষে নিজ কর্মক্ষেত্রে অন্তত দশ বছর যোগ্যতা ও নিষ্ঠার প্রমাণ রাখতে পারলে তারপর সনদ প্রদান করা; অন্যথায় গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাকোর্সের নামে শুধু সাইনবোর্ড ঝুলানো থেকে বিরত থাকা।

বিবেকের তাড়নায় ক্ষুদ্র উপলব্ধি থেকে কয়েকটি প্রস্তাব কিছুটা আত্মসমালোচনার আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হল, যেন বড় বড় চিন্তাবিদগণ এদিকেও একটু দৃষ্টিপাত করেন। কমপক্ষে রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়ার সদস্যরা যেন নিজ নিজ গণ্ডিতে এর আলোকে কর্মপন্থা নির্ধারণের চিন্তা করেন। وما علينا الا البلاغ

আ ত্ম জী ব নী

*দারুল উলূম করাচির মুখপত্র মাসিক আল-বালাগ শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের ধারাবাহিক আত্মজীবনী 'ইয়াদেঁ' প্রকাশ করছে। রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়ার মুখপত্র দ্বি-মাসিক রাবেতা ইয়াদেঁ-এর ধারাবাহিক অনুবাদ প্রকাশ করছে। মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের সম্মতিক্রমে অনুবাদ করছেন জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) থেকে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা সমাপনকারী, বর্তমানে দারুল উলূম করাচির ইফতা বিভাগে অধ্যয়নরত **মাওলানা উমর ফারুক ইবরাহীমী**।*

ইয়াদেঁ - یادیں

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

(ষষ্ঠ পর্ব - چھٹی قسط)

আমি ইতোপূর্বে বলে এসেছি, দেওবন্দে হযরত আব্বাজান মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. ব্যবসার উদ্দেশ্যে দারুল ইশা'আত নামে একটি কুতুবখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাকিস্তান হিজরতের সময় অগত্যা সেটি দেওবন্দেই ছেড়ে আসতে হয়েছিলো। ভাইজান জনাব মুহাম্মদ যাকী কাইফী রহ. সেটি দেখাশোনা করতেন। প্রথমত কুতুবখানার আয়-উপার্জন ছিলো খুবই সীমিত, দ্বিতীয়ত সে পরিস্থিতিতে সেটিকে পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করার কোন উপায় ছিলো না। পাকিস্তানে আসার পর হযরত আব্বাজান রহ. কিভাবে যেন ছোটো-খাটো কয়েকটি পুস্তিকা ছেপেছিলেন। কিন্তু এটা সে সময়ের কথা, যখন লুটতরাজের শিকার উর্দূভাষী মুহাজিরগণ সর্বস্বান্ত অবস্থায় পাকিস্তানে আসছিলেন। সে সময় তাদের সবচেয়ে বড় চিন্তা ছিলো নিজেদের অন্ন ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। এমতাবস্থায় উর্দূ পুস্তিকাদির এত চাহিদা ছিলো না যে, মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্যয় উঠানোর পর কিছু আয়-রোজগার হতে পারে!

এহেন আর্থিক দৈন্যদশার পাশাপাশি আব্বাজান রহ.-কে আরো একটি দুশ্চিন্তা সবসময় তাড়িয়ে বেড়াতো। সেটি হচ্ছে তাঁর কমজোর বৃদ্ধা মা, যাকে তিনি হিজরতকালে হিন্দুস্তানে রেখে এসেছিলেন, এখন কিভাবে তাকে পাকিস্তান আনবেন? মরহুমা দাদীজান হযরত গঙ্গুহী রহ.-এর কাছে বাই'আত ছিলেন। আমরা গোটা জীবনে কখনও তাকে আল্লাহর যিকির বিহীন অবস্থায় পাইনি। এমনকি তার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে আল্লাহ, আল্লাহ ধ্বনি আমরা প্রতিনিয়ত শুনতে পেতাম। আব্বাজান রহ.-এর ইচ্ছা ছিলো কালবিলম্ব না করে তাকে পাকিস্তান নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা। দাদীজান রেলভ্রমণেও সক্ষম ছিলেন না। ওদিকে ভাইজানও আমাদের দেওবন্দের বাড়িতে একাকী হয়ে পড়েছিলেন। তার বয়স তখন বড়জোর বাইশ কি চব্বিশ বছর ছিলো। বাবা-মা, ভাই-বোন থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তার তখনকার মানসিক অবস্থা কেমন ছিল, তার কিছুটা নিম্নোক্ত শ্লোকগুচ্ছ থেকে আঁচ করা যায়। যখন ঈদ ঘনিয়ে এলো, তিনি আমাদের ভাই-বোনদের নামে একটি বিরহকাতর কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন। সে কবিতার কয়েকটি পংক্তি আজও আমার মনে আছে–

مانا کہ میں دل درد کا خوگر ہی بنا لوں
لیکن جو خلش چھپ نہ سکے، کیسے چھپا لوں
تم عید کی خوشیوں سے کرو گھر میں چراغاں
میں اپنا ہی دل اپنے ہی داغوں سے سجا لوں
ماں.باپ جدا، بھائی بہن پاس نہیں ہیں
ایسے میں بتاؤ کہ میں کیا عید منالوں؟

হৃদয়কে না হয় বেদনার আঁতুড়ঘর
বানিয়ে নিলাম!
কিন্তু অনিরুদ্ধ যাতনা বলো কীভাবে
লুকাই!?
ঈদের আনন্দে তোমাদের গৃহে জ্বলে
শামাদান,
আমি না-হয় হৃদয়খানা ছাই-ভস্মেই
সাজিয়ে নিলাম!
মা-বাবা কাছে নেই, ভাই-বোনও চোখের
আড়াল,
বলো, তবে আর কী দিয়ে আমি মানাবো
ঈদ!?

আব্বাজান রহ.-এর জন্য দুশ্চিন্তার তৃতীয় বিষয় ছিলো আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা। আমরা চার ভাই যারা আব্বাজানের সঙ্গে পাকিস্তান চলে এসেছিলাম, সবারই শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন ছিলো। আর তখন পুরো করাচিতে 'মহল্লা খাড্ডা'য় মাযহারুল উলূম নামে একটিমাত্র মাদরাসা ছিলো। তা-ও আবার সেটি ছিলো আমাদের বাসা থেকে যথেষ্ট দূরে। ফলে সেখানে গিয়ে পড়াশোনা করা আমাদের জন্য সহজ ব্যাপার ছিলো না।

ওদিকে আব্বাজানের জন্য সবচে বেশী কষ্টের কারণ ছিলো, দেওবন্দ থেকে হিজরত করে আমরা যে এলাকায় এসে উঠেছি, সেখানে বেশিরভাগ ইংরেজ ও পার্সিদের বসবাস ছিলো। অল্পসংখ্যক মুসলমান এখানে থাকতেন। সে বেচারারাও 'ইল্লা মাশাল্লাহ' দীন সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখতেন না। সে এলাকায় দূর-দূর পর্যন্ত কোন মসজিদের দেখা মিলতো না। প্রথমদিকে আব্বাজান রহ. জামা'আতে শরীক হবার জন্য বহুদূর তাশরীফ নিয়ে যেতেন। পরবর্তীতে তিনি এলাকাবাসীর সহায়তায় একটি ছাপড়া বানিয়ে নেন। সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতের সাথে শুরু হয়ে গেলো। এরপর একসময় মসজিদের জন্য ছাপড়া বরাবর গলিতে একটি জায়গারও ব্যবস্থা হয়ে গেলো। সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে এবং আজ অবধি মসজিদটি কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আলহামদুলিল্লাহ!

এ সময়কার আরেকটি জটিলতা এই ছিলো যে, প্রতিদিনই হিন্দুস্তান থেকে মুহাজিরদের কাফেলা করাচী এসে পৌঁছতো। তাদের মধ্যে আমাদের কিছু আত্মীয়-স্বজনও ছিলেন। এখানে আব্বাজান ছাড়া তাদের কোন আশ্রয়স্থলও ছিলো না। ফলে তারা প্রায় স্থায়ীভাবে আমাদের ঘরের মেহমান হয়ে থাকতেন। তাদের চাকরি-বাকরিসহ যাবতীয় দায়দায়িত্বও আব্বাজানের কাঁধে ছিলো। এছাড়াও আব্বাজান বিচ্ছিন্নভাবে আসা মুহাজিরদের পাশে থাকার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন।

মোটকথা, আব্বাজান রহ. নানা ঘাত-প্রতিঘাত সয়ে সয়ে কালাতিপাত করছিলেন। তিনি কিভাবে সে কঠিন সময়ের মুকাবেলা করেছেন আজ তার কল্পনাও আমাদের জন্য দুরূহ ব্যাপার। তিনি ছিলেন আমাদের জন্য আপাদমস্তক একজন স্নেহপ্রবণ পিতা। ঘরের লোকেরা হামেশাই তাকে প্রফুল্লচিত্ত,

সহাস্যমুখ দেখতেন। বরং আমাদের মনোতুষ্টির জন্য কখনো আমাদেরকে আনন্দভ্রমণেও নিয়ে যেতেন। সে সময় করাচীতে আনন্দভ্রমণের জন্য সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ও দর্শনীয় স্থান ছিলো ক্লিফটন সমুদ্রসৈকত। সেটাকে তখন 'হাওয়া বন্দর' বলা হতো। শহর থেকে বেশ দূরে হওয়ায় সেখানে গাড়িঘোড়াও তেমন যেতো না। তাই দিনের বেলায়ও সেখানে বিরাজ করতো সুনসান নীরবতা। আব্বাজান ঠিক সে সময়েই পরিবারের সবাইকে সেখানে নিয়ে যেতেন। আজ সেখানে বিশালায়তনের পার্ক বানিয়ে রাখা হয়েছে। সে সময়ে ঠিক এখানেই সমুদ্রের তীর ছিলো। আর সেই পুরোনো পুল যেটি এখন পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্তে গিয়ে মিশেছে, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ সেই পুলের সামনের অংশে এসে আছড়ে পড়তো। এখানেই আমরা সমুদ্রে নেমে নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী গোসল করতাম। ঘর থেকে সঙ্গে করে দুপুরের খাবার নিয়ে যাওয়া হতো। সবাই মিলেমিশে খেয়েদেয়ে সন্ধ্যে নাগাদ ঘরে ফিরে আসতাম। এমনিভাবে আব্বাজান রহ. কখনো আমাদেরকে নিয়ে নৌভ্রমণে বেরোতেন। সমুদ্রের কোলঘেষে পাল উড়িয়ে ছুটে চলা নৌকাগুলো 'মানোড়া' গিয়ে ঘাট বাঁধতো। দিনভর সেই আনন্দভ্রমণ আমাদের ছোটদের জন্য কতই না আনন্দঘন ছিলো!

একদিকে তিনি উল্লিখিত নানাবিধ সমস্যাপীড়িত থাকা সত্ত্বেও আমাদের মনোতুষ্টির জন্য এ ধরনের আনন্দভ্রমণে নিয়ে যেতেন এবং আনন্দভ্রমণের ফাঁকে ফাঁকে বুযুর্গদের ঘটনাবলী এবং মূল্যবান নসিহত শুনিয়ে শুনিয়ে আদর্শবান হবার প্রেরণা যোগাতেন। অন্যদিকে আল্লাহ তা'আলা হযরত আব্বাজানকে অভাবনীয় ইলমী একাগ্রতা দান করেছিলেন। ফলে কোন অবস্থাতেই তিনি এই ব্যস্ততাকে ছেড়ে দেননি। যদিও দীর্ঘকাল থেকে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতিয়ে আযম পদবী থেকে অবসরপ্রাপ্ত ছিলেন, তথাপি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফিকহী প্রশ্নাবলী তাঁর কাছে আসতেই থাকতো। উল্লিখিত ঝামেলার মাঝেও তিনি এসব প্রশ্নের জবাব লিখতে থাকতেন।

দেওবন্দ থেকে যদিও তিনি বেশি সামানাপত্র সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারেননি। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিতাবাদি, হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি এবং বুযুর্গদের চিঠিপত্র ও বরকতপূর্ণ হাদিয়া ভাণ্ডার অত্যন্ত যত্নের সাথে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি বলতেন, কাস্টমসের তল্লাশির সময় এসব কাগজপত্র নিয়ে আমার সবচেয়ে বেশি চিন্তা হচ্ছিলো। অথচ কাস্টমসকর্মীদের এদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপই ছিলো না। তাদের তো ধান্ধা ছিলো, কেউ যেনো সোনা-রূপা ও সেলাইবিহীন কাপড় নিয়ে যেতে না পারে। এভাবে আব্বাজানের ইলমের এক বিশাল ভাণ্ডার তাঁর সঙ্গে পাকিস্তান চলে আসে। এমনকি হযরত শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী সাহেব রহ.-ও সঙ্গে করে এতো কিতাবপত্র আনতে পারেননি। ফলে তার কখনো কোন মাসআলা তাহকীকের প্রয়োজন হলে তিনি চারতলা সিঁড়ি বেয়ে আমাদের ঘরে চলে আসতেন এবং মুতালা'আ করতেন।

ধীরেধীরে আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানিতে এসব সমস্যার সমাধান শুরু হলো। আব্বাজানের কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব মিলে করাচিতেই একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। সেখানে আব্বাজানও শরীক ছিলেন। অন্যদিকে ভাইজান যিনি দেওবন্দে কুতুবখানা চালাচ্ছিলেন, কিভাবে যেনো সেটা গোছগাছ করে তিনিও পাকিস্তান চলে এসেছিলেন। আমাদের দাদীজানকেও তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। দাদীজানের জন্য রেলের লম্বা সফর ছিলো অসহনীয়। তাই ভাইজান তাকে দিল্লী থেকে বিমানযোগে নিয়ে এসেছিলেন। সেদিন আমাদের ঘরে যেনো আনন্দের বন্যা বইছিলো। আমরা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে ডার্ক রোডের বিমানবন্দরে ছুটে গিয়েছিলাম। ডার্ক রোডের বিমানবন্দর তখন শহর থেকে যথেষ্ট দূরে মনে হতো। মাঝে একটা বড়সড় জঙ্গল পড়তো। সে সময় ওরিয়েন্ট এয়ারওয়েজ নামে কেবল একটি এয়ারলাইন্স পাক-ভারত যাতায়াত করতো। বিমান রানওয়ে স্পর্শ করতেই আমার কচিমন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিল। এটাই ছিলো আমার জীবনে প্রথম বিমানদর্শন। আমাদের সবার দৃষ্টি তখন বিমানের দরজায় নিবদ্ধ। কিছুক্ষণ পর ভাইজানকে দরজায় দেখা গেলো। তিনি মুচকি হেসে হাত নেড়ে ফের ভেতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর দাদীজানকে ধরে ধীরে ধীরে নেমে আসলেন। এভাবেই আব্বাজানের একটি বড় পেরেশানীর ইতি ঘটলো।

ভাইজান সাধ্যমতো সাথে করে কিতাবাদি নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু অবশিষ্ট বিশাল ভাণ্ডার জাহাজ ছাড়া আনা সম্ভব ছিলো না। আল্লাহ তা'আলা এর জন্য একটি সমাধান বের করে দিলেন। মাওলানা নূর আহমাদ সাহেব রহ. নামে আব্বাজানের একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনি ছিলেন বার্মার আকিয়াব জেলার অধিবাসী। পড়াশোনার জন্য দারুল উলূম দেওবন্দে এসেছিলেন। এ সূত্রেই আব্বাজানের সঙ্গে তার গভীর হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিলো। আব্বাজান পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার ফলে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ইস্তফা নিয়ে নিয়েছিলেন। কারণ, দারুল উলূম দেওবন্দে থাকাকালীন কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অনুমতি ছিলো না। এই ইস্তফানামা তিনি নিজ শায়খ হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী রহ.-এর ইঙ্গিতে জমা দিয়েছিলেন। হযরত মাওলানা নূর আহমাদ সাহেব রহ.-এর আব্বাজানের সাথে চমৎকার সম্পর্কের ফলে তিনি দরসের বাইরেও আব্বাজানের কাছে কিছু কিতাবাদি পড়েছেন। তিনি বেশিরভাগ সময় আব্বাজানের খেদমত ও সোহবতে ব্যয় করতেন। আব্বাজান পাকিস্তান চলে আসার পর তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন এবং নিজেও পাকিস্তান হিজরত করতে উদগ্রীব ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে পাহাড়সম হিম্মত দান করেছিলেন। দুঃসাধ্য কাজ তিনি নিমেষেই করে ফেলতে পারতেন। আব্বাজানের অবশিষ্ট কিতাবাদি দেওবন্দ থেকে পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তিনি সানন্দে নিজ কাঁধে তুলে নিলেন। সুতরাং এমনটাই হলো এবং তাঁর হাত ধরেই এই বিশাল কুতুবখানা পাকিস্তান পৌঁছে গেলো। আব্বাজান রহ. তার সাথে নিজ ভাগ্নে জনাব ফখরে আলম সাহেব রহ.-কেও একই জাহাজে ডেকে পাঠিয়েছেন। সুতরাং উভয়ে সামুদ্রিক জাহাযে পাকিস্তান চলে আসলেন।

আমার পড়াশোনার হাতেখড়ি

হযরত শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ.-এর করাচিতে কোন নিজস্ব আবাসস্থল ছিলো না। তবে জামশেদ রোডস্থ আমেল কলোনিতে মুসলিমলীগের নেতা এইচ এম কুরাইশী সাহেবের বাংলো ছিলো। কুরাইশী

সাহেব আবদার করেছিলেন, হযরত যেনো তার বাড়িতেই থাকেন। সে সুবাদে হযরত সেখানেই থাকতেন এবং আব্বাজান রহ. করাচী আসার পর পাকিস্তানের নিত্যনতুন সংকটে পরামর্শের জন্য হযরতের কাছে ছুটে যেতেন। হযরত থেকে দু'আ নেয়ার জন্য মাঝেমধ্যে আমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। আমার মনে পড়ে, একবার আমি একটি দৃষ্টিনন্দন গিলাফে আচ্ছাদিত বাগদাদী কায়দা নিয়ে তার সামনে বসা ছিলাম। খুবসম্ভব তখন আব্বাজান আমাকে হযরত থেকে 'বিসমিল্লাহ' করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন।

এদিকে হযরত মাওলানা ইহতিশামুল হক সাহেব রহ. জ্যাকব লাইনে একটি মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিলেন। তখন এর ছাদ ছিলো টিনের। মসজিদের সাথেই তার বাসা ছিলো। সেই মসজিদে তিনি একটি ছোট্ট মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মাদরাসাটি তখন শুধু হিফয ও নাযেরা বিভাগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো। আব্বাজান আমার বড়ভাইদেরকে ওখানেই ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। মুহতারাম বড়ভাই জনাব মুহাম্মাদ ওলী রাযী সাহেব পড়তেন কারী মুহাম্মাদ যাকারিয়া রহ.-এর কাছে। আর হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ রফী উসমানী সাহেব পড়তেন জনাব হাফেয নাযীর আহমাদ সাহেব রহ.-এর কাছে। বয়স স্বল্পতার কারণে আব্বাজান আমাকে তখন আর ওখানে ভর্তি করাননি। ফলে আমি ঘরেই হযরত মাওলানা নূর আহমাদ রহ.-এর কাছে বাগদাদী কায়দা পড়া শুরু করে দিয়েছিলাম।

তখনো কায়দা শেষ হয়নি। বরং তার সিংহভাগই বাকি। এমতাবস্থায় একদিন দেওবন্দ থেকে চিঠি মারফত জানতে পারলাম, আমার ভাগ্নি– যে বয়সে আমার চেয়ে একবছরের বড় ছিলো– আলিফ-লাম-মীম পারা শুরু করে দিয়েছে। আমি পূর্বে বলেছি, হযরত মাওলানা নূর আহমাদ সাহেব কঠিনতম কাজ নিমেষেই করে ফেলতে পারতেন। তিনি যখন জানতে পারলেন, আমার সমবয়সী ভাগ্নি দেওবন্দে আলিফ-লাম-মীম পারা শুরু করে দিয়েছে, তিনি বললেন, তুমি কায়দা অনেক পড়ে ফেলেছো। এবার তোমাকে আমপারা শুরু করিয়ে দিচ্ছি। এমনটাই হলো। কায়দা শেষ করার আগেই আমপারা শুরু করে দিলাম। মাওলানা নূর আহমাদ সাহেব এভাবেই আমাকে নাযেরা কুরআন শরীফ পড়াতে থাকলেন। দেখতে দেখতে আমার সাত পারা পূর্ণ হয়ে গেলো। এরপর তিনি আমাকে বললেন, এখন তো তুমি আরবী অক্ষরের সাথে পরিচিত হয়ে গেছো, তাই অবশিষ্ট অংশ নিজে নিজেই পড়ে শেষ করো। তারপর দ্রুত বেহেশতী যেওরের উর্দূ ব্যাকরণ পাঠ চুকিয়ে বেহেশতী গওহর শুরু করে দিয়েছিলাম। মনে পড়ছে, আমি বেহেশতী গওহর শুরু করার পর এর প্রথম বাক্য ছিলো–

یہ عالم شروع میں ناپید تھا

এখানে 'ناپید' (অস্তিত্বহীন) এর মতলব বা উদ্দেশ্য বুঝতে আমাকে সীমাহীন ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে। এর উদ্দেশ্য বুঝার জন্য স্বীয় উস্তাযে মুহতারামকে বারবার প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে হয়েছে। যাই হোক! সবেমাত্র অল্পকিছু পাঠ শেষ করেছি, এদিকে হযরত মাওলানা ইহতিশামুল হক সাহেব নিজ মাদরাসায় দরস শুরু করে দিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে ওখানেই আমার ধারাবাহিক শিক্ষাজীবন শুরু হয়ে গেলো। সেখানে হযরত মাওলানা বদরে আলম সাহেবের মতো ব্যক্তিও দরস দিয়েছেন। সম্ভবত আব্বাজান রহ.ও কিছু সময় দরস দিয়েছেন। হযরত মাওলানা নূর আহমাদ সাহেবও ওখানে শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করেন।

আমি বেহেশতী গওহর, সীরাতে খাতামুল আম্বিয়ার কিছু অংশ আমার আম্মাজানের কাছে পড়া শুরু করেছিলাম। আর এটাই আমার উর্দূ ভাষা শিক্ষার শুরু-শেষ। এই দুই কিতাব ছাড়া আমি উর্দূ ভাষা শেখার জন্য ভিন্ন কোন কিতাব পড়িনি। অপরদিকে প্রতিদিন আমি নিজে নিজেই কুরআন শরীফের কিছু অংশ পড়তাম। কুরআন শরীফ বালিশের উপর রেখে চৌকিতে বসেবসে পড়তাম। কখনো আম্মাজান বা ঘরের ভাই-বোনদের কাউকে শুনিয়ে নিতাম। এভাবে নিজে নিজে পড়েই কোন এক সাতসকালে আমার নাযেরা পূর্ণ হয়েছিলো আলহামদুলিল্লাহ!

আমি দেখতাম, বাচ্চারা কুরআন শরীফ নাযেরা বা হিফয সমাপন করার পর ব্যাপকভাবে তাদের জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। সেটাকে 'আমীন' অনুষ্ঠান বলা হতো। আবার কখনো মিষ্টি বিলিয়ে আনন্দ উদযাপন করা হতো। কিন্তু আমি যেদিন নিজে নিজে পড়ে নাযেরা খতম করেছিলাম, কারো জানাও ছিলো না যে, আজ আমার কুরআন খতম হচ্ছে। একাকী কামরায় বসে শেষ আয়াতটি পড়ে আমি কুরআন শরীফ বন্ধ করে রেখে দিয়েছিলাম। আমার দিলের সেই আক্ষেপ আজও আমাকে পোড়ায়! না কেউ দেখার মতো ছিলো, না শোনার মতো। না কোন অনুষ্ঠান ছিলো, না কোন সম্মিলন।

পরিশেষে আমি আব্বাজানকে বললাম, আজ আমার কুরআন শরীফ খতম হয়েছে। এটা শুনে তার যেনো খুশি ধরে না! আব্বাজান আমাকে পুরস্কৃত করার জন্য আমার বড় দুই ভাই মাওলানা মুহাম্মাদ ওলী রাযী এবং হযরত মুহাম্মাদ রফী উসমানী (মাদ্দাযিল্লুহুমা) -কে বাজারে পাঠিয়েছেন। আমি ঘরের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে তাদের ফিরে আসার প্রহর গুনছিলাম। দূর থেকে তাদেরকে আসতে দেখে দেখেই আমার কচিমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তখন তাদের হাতে নীলরঙের একটি খেলনা গাড়ি ছিলো। সেটা তারা নিজেরাও খেলতে খেলতে নিয়ে আসছিলেন। হাতে পেয়ে আমার আর খুশির সীমা রইলো না। গাড়িটি ছিলো খুবই সাধারণ কিন্তু দেখতে অত্যন্ত চমৎকার। আমার ছোট্ট ভুবনে তখন এটিই ছিলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এখন অনুভব করি, মানুষ তার ধ্বংসশীল জীবনের বাঁকেবাঁকে যে জিনিসের মোহে অন্ধ ও বধির হয়ে থাকে, পরবর্তীকালে তার কথা ভেবেও হাসি পায়। এভাবে এমন একসময়ও আসবে, যখন এই অঢেল জায়গা-জমি, টাকা-পয়সাও মিথ্যে ও ছলনা মনে হবে।

بدنامئ حیات دو روزے نہ بود بیش.
آں ہم بتو کلیم چہ گویم چساں گذشت
یک روز وقف بستن دل شود بہ ایں و آں
روز دگر بہ کندن دل زیں و آں گذشت

(ভাবানুবাদ)

জীবন সে-তো একটি দিন,
বসুন শোনাই গল্প তার!
গাঁঠরি বেঁধে দিবস শেষ,
খুলতে বাঁধন রাত কাবার!

তাবলীগী বয়ান

১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে টঙ্গী-ময়দানে পুরানাদের দশদিনের জোড়ে প্রদত্ত মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব রহ.-এর জরুরী বয়ান

বয়ানলেখক : প্রফেসর শেখ আবুল ক্বাসিম

যামানার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দাঈ হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান রহ. ছিলেন হযরতজী মাওলানা ইলয়াস সাহেব রহ. এর বিশেষ সোহবাতপ্রাপ্ত। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একাধারে নয় বছর বাংলাদেশের টঙ্গীতে পুরানাদের জোড় উপলক্ষে তিনি আগমন করলে কাকরাইলের শীর্ষস্থানীয় মুরুব্বী হাজী আব্দুল মুক্বীত সাহেব রহ.-এর-র নির্দেশে আমি তাঁর সফরসঙ্গী ও সার্বক্ষণিক বয়ানলেখক হিসেবে সোহবত লাভ করে ধন্য হয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের জোড়ে ২০ সেপ্টেম্বর, রবিবার বাদ মাগরিব তিনি ঈমানে মুফাসসালের সাতটি বিষয় ও দাওয়াতের মেহনত সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বয়ান পেশ করেন। সারা বিশ্বের বর্তমান ও কেয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা উম্মতের খেদমতে বয়ানটির অংশবিশেষ পেশ করা হল। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে বয়ানের প্রতিটি কথা সহীহভাবে বুঝে সহীহভাবে আমল করে উভয় জগতে কামিয়াব হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

হামদ ও সালাতে পর...

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অর্থ : ভালো ও মন্দ সমান হয় না। তুমি মন্দকে প্রতিহত কর এমন পন্থায়, যা হবে উৎকৃষ্ট। তার ফল হবে এই যে, যার ও তোমার মধ্যে শত্রুতা ছিল, সে সহসাই হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর এ গুণ কেবল তাদেরকেই দান করা হয়, যারা সবরের পরিচয় দেয় এবং এ গুণ কেবল তাদেরকেই দান করা হয় যারা মহাভাগ্যবান। যদি শয়তানের পক্ষ থেকে তোমার কখনও কোন খোঁচা লাগে, তবে (বিতাড়িত শয়তান থেকে) আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করো, নিশ্চয়ই তিনি সকল কথার শ্রোতা, সকল বিষয়ের জ্ঞাতা। (সূরা হা-মীম সাজদাহ-৩৪-৩৬)

إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ..

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় আমি শিক্ষাদানকারীরূপে প্রেরিত হয়েছি। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ২২৯)

মেরে দোস্তো আওর বুযুর্গ!

এক হলো মুশাহাদা অর্থাৎ যা আমার চোখের সামনে আছে, যা আমার দু'চোখ দেখছে। যেমন: চাঁদ দেখি, সূর্য দেখি, যমীন দেখি, পাহাড় দেখি, সাগর দেখি, গাড়ী দেখি, উড়োজাহাজ দেখি, আরও কত কি দেখি। মানুষ, জন্তু, বাড়ী-ঘর, হাট-বাজার, স্বর্ণ-চান্দি, চীজ-আসবাব এককথায় আমরা দু'চোখে যা-ই দেখি ও অনুভব করি তা-ই মুশাহাদা। একেই দুনিয়া বলা হয়।

আর এক হলো গায়ব। গায়বী নেযাম নজরে আসে না। কিন্তু তার খবর দেয়া হয়েছে রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে।

মুশাহাদা কাফেরও মানে এবং স্বীকার করে। কোন কাফের বা নাস্তিককে যদি জিজ্ঞেস করা হয়– পাহাড় আছে? বলবে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাহাড় তো আছে। এভাবে দু'চোখে যা কিছু দেখা যায় বা পঞ্চইন্দ্রীয় দ্বারা অনুভব করা যায় তা কাফের মুশরিকও স্বীকার করে। কিন্তু গায়বী নেযাম কাফের মানে না। আর ফাসেক সন্দেহ করে। ফাসেক ভাবে, আমার জীবনের সম্পর্ক তো মুশাহাদার সাথে এবং সে মুশাহাদার মধ্যেই তার যাবতীয় সমস্যার সমাধান খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু মুমিন বান্দাগণ গায়বী নেযামকে ভয় পায় এবং গায়বের মধ্যেই তার যাবতীয় সমস্যার সমাধান রয়েছে একথার ঈমান রাখে। সে জানে ও মানে যে, মুশাহাদা গায়বী নেযামের নীচে পর্দা হিসেবে কাজ করে।

আমাদেরকে গায়বের প্রতি ঈমান আনার হুকুম করা হয়েছে। ঈমানে মুফাসসালে গায়বের মৌলিক বিষয়গুলো সাফসাফ বলে দেয়া হয়েছে।

آمنت بالله وملئكته وكتبه و رسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت.

অর্থ : আমি ঈমান আনলাম আল্লাহ তা'আলার উপর, তার ফেরেশতাগণের উপর, তার নাযিলকৃত কিতাবসমূহের উপর, তার প্রেরিত রাসূলগণের উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ভালো ও মন্দ সবকিছু আল্লাহর পক্ষ হতে হয় একথার উপর এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার উপর।

এখানে হুকুম দেয়া হয়েছে, আমরা যেন এসব গায়বী বিষয়ের প্রতি ঈমান আনি, গায়বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি।

আল্লাহ গায়ব, আমাদের নজরে আসে না। কিন্তু আল্লাহই সব কিছু করছেন। আল্লাহরই নেযাম গোটা বিশ্বজগতে চলছে। আমার উপরও চলছে। আমার উপর যে সকল হালত আসে, আমি যেসব অবস্থার সম্মুখীন হই সব আল্লাহই করেন। কখনও ইজ্জত দেন, কখনও যিল্লত দেন। কখনও স্বস্তি দেন, কখনও পেরেশানী দেন। কখনও ফকীর বানান, কখনও ধনী বানান। এই সবকিছু আল্লাহই গায়ব থেকে করছেন।

গায়বের প্রতি বিশ্বাস মজবুত হলে অন্তরে আল্লাহর ভয় পয়দা হয়। গায়বে বিশ্বাসী বান্দা এই ভয় করে, যদি আল্লাহর হুকুমের খেলাফ চলি, হতে পারে আল্লাহ আমাকে অন্ধ করে দিবেন। আমার যবান, হাত, পা ও কান দ্বারা আল্লাহর হুকুমের খেলাফ হয়ে গেলে না-জানি আমার উপর কওমে লূতের মতো পাথর বর্ষণ করা হয়, কওমে 'আদের মতো তুফান প্রেরণ করা হয়, কওমে নূহের মতো প্লাবন দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়, কওমে শু'আইবের মতো ভূমিকম্পের আযাবে গ্রেফতার করা হয়! মোটকথা, গায়বের প্রতি ইয়াকীন হলে মানুষ আল্লাহর আযাবকে ভয় করে চলে। يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ অর্থ: তারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে। (সূরা আম্বিয়া-৪৯)

গায়বের প্রতি ঈমান থাকলে মানুষ আল্লাহকে ভয় করতে থাকে। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। যে ব্যক্তি সব রকম গোনাহ ও অন্যায় কাজ করে চলছে তার আসলে গায়বের প্রতি ঈমানই নেই। সে শুধু বাচ্চার মতো শব্দ আওড়াচ্ছে। বাচ্চাকে যদি বলা হয়, মাদরাসায় না গেলে মাথার উপর পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে, আর গেলে জান্নাতে বালাখানা মিলবে; সে যাবে না। আজ আমাদের ঈমানের

অবস্থাও এই বাচ্চার মতো। হ্যাঁ, বাচ্চার বাবা যদি বলে, মাদরাসায় যাও, নইলে দেবো কিন্তু এক থাপ্পড়; তখন যাবে। বাবার থাপ্পড়কে তো ভয় পায়, কিন্তু আল্লাহর আযাবকে ভয় পায় না। অর্থাৎ তার মধ্যে মুশাহাদার ভয় আছে, আল্লাহর ভয় নেই। এমনি অবস্থা আজ আমাদের। নাফরমানীর উপর আল্লাহর ধমককে ভয় পাই না। হ্যাঁ, সরকারের ধমককে ভয় পাই। যদি বলা হয়, এক বছরের জন্য আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে যাও, বেহেশতে উঁচা মর্তবা লাভ করবে, এমনকি এরপর যদি বেহেশতের নেয়ামতের বর্ণনাও শুনিয়ে দেয়া হয়, তবুও প্রস্তুত হয় না।

عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ... جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا

সোনার তারে বোনা উঁচু আসনে, তারা পরস্পর সামনাসামনি হেলান দিয়ে থাকবে। তাদের সামনে (সেবার জন্য) ঘোরাফেরা করবে চিরকিশোরেরা, এমন পান-পাত্র, জগ ও প্রস্রবণ-নিসৃত স্বচ্ছ সুরাপাত্র নিয়ে...। আর এসব হবে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান। তারা সে জান্নাতে শুনবে না কোন অহেতুক কথা এবং না কোন পাপের কথা। তবে সেখানে হবে কেবল শান্তিপূর্ণ কথা, কেবলই শান্তিপূর্ণ কথা। (সূরা ওয়াকিয়া-১৫-২৬)

জ্বী-হ্যাঁ, সোনার পালঙ্কে উপবিষ্ট হবে। চির যৌবন লাভ হবে, সুদর্শন বাচ্চারা পবিত্র শরাব পান করাবে, রকমারি ফল মিলবে, জান্নাতের সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারবে, পাখির ভুনা গোশত খাবে। অপরূপ সুন্দরী লুক্কায়িত মোতির মত হুর মিলবে। এসব শুনেও দিলে প্রভাব পড়ে না। এক বছরের জন্য আল্লাহর রাস্তায় বের হতে তৈরি হয় না। কারণ, এগুলো গায়বী বিষয়।

এসব শুনে আল্লাহর বান্দা ভাবে, কে জানে জান্নাত আছে কিনা!? তার অন্তর ব্যাধিযুক্ত, সন্দেহে ভরপুর। কিন্তু সরকার যদি বলে, এক বছরের জন্য অমুক দেশে যাও, বাড়ী মিলবে, জমি মিলবে, বিবি মিলবে তাহলে কিন্তু খুশিখুশ রাজি হয়ে যাবে। অর্থাৎ এখনও তার ঈমান মুশাহাদার উপর, গায়বের উপর তার ঈমান নেই।

এ-ই কারণ যে, জান্নাতের নেয়ামতরাজির বর্ণনা শুনি কিন্তু জান্নাত হাসিল করার আগ্রহ পয়দা হয় না। কারণ, গায়বের প্রতি আমাদের ঈমান কমজোর হয়ে গেছে। দুনিয়ার জিনিস দেখতে দেখতে তার প্রতিই ইয়াকীন জমে গেছে। যদি বলা হয়, ওঠো, এমন এক রাজত্ব বণ্টন করা হবে, যার প্রশস্ততা ৫০ হাজার মাইল বর্গমাইল, তো লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। অথচ এই রাজত্ব বন্যায়, ভূমিকম্পে বিরান হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও এই ধ্বংসশীল অস্থায়ী জিনিসের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি বলা হয়–

قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ

অর্থ: ঐ জান্নাতের পানে অগ্রসর হও, যার প্রশস্ততা আসমান-যমীন বরাবর। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৯০১) তাহলে তাতে সন্দেহ হবে। অনুরূপ যদি বলা হয়–

إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ

অর্থ : (জাহান্নামের) সে আগুন অট্টালিকাতুল্য বড় বড় স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে। মনে হবে তা হলুদ বর্ণের উট, সেদিন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য রয়েছে বড় দুর্ভোগ। (সূরা মুরসালাত-৩২-৩৪) তাহলে একটুও ভয় পাবে না। তার অন্তরে জাহান্নামের ভয় নেই। কিন্তু দুনিয়ার আগুন জ্বালিয়ে যদি বলা হয়, এর ভেতর ঢুকে পড়ো, তাহলে ঠিকই ভয় পাবে। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে যে খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিচ্ছেন তাতে বিশ্বাস হয় না।

আশা ও ভয়ের মাঝে ঈমান

নেয়ামতের শওক (আগ্রহ), জান্নাতের শওক, আল্লাহর মদদ, রহমত ও বরকতের শওক থাকা এবং নাফরমানীর বিপরীতে যে সব আযাবের ধমকি দেয়া হয়েছে, সেই আযাবের ভয় থাকার নাম ঈমান। একটা হল ঈমানের আলফায বা বুলি, সেটা ঈমান না। ঈমান তাকেই বলে, যা আল্লাহর হুকুমের ওপর আমল করায়। জান্নাতের শওক এত হবে যে, দুনিয়া তুচ্ছ মনে হবে, মাটি মনে হবে। জাহান্নামের ভয় এত হবে যে, দুনিয়ায় কোন কষ্টই কষ্ট মনে হবে না।

আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালা-ইকাতিহী

মালা-ইকাতিহী হল ফেরেশতাগণের উপর বিশ্বাস। ফেরেশতারা আল্লাহর ফৌজ, তার বাহিনী। আল্লাহ বলছেন,

وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ

অর্থ: আর নিশ্চয় আমার বাহিনীই বিজয়ী হবে। (সূরা সাফফাত-১৭৩)

আল্লাহর ফৌজের সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। যখন আল্লাহর যিকির করা হয় ফেরেশতারা বেষ্টন করে ফেলে। যিকির করার সময় আমাদের কি এই ধ্যান হয় যে, আমি এখন ফেরেশতাদের বেষ্টনীর মধ্যে পূর্ণ নিরাপত্তায় রয়েছি? জান্নাত লাভ করার আগ্রহ হওয়া। জাহান্নাম থেকে বাঁচার আগ্রহ হওয়া। এর জন্য আমল করা। সর্বোপরি আল্লাহকে ভয় পাওয়া। তাহলে অন্তরে সাকীনা/ প্রশান্তি নাযিল হবে। প্রত্যেকের সাথে সি.আই.ডি. হিসেবে দু'জন করে ফেরেশতা আছে; একজন ভালো আমল লিখছে আর অপরজন খারাপ আমল লিখছে।

আমাদের কি এই ভয় হয় যে, যদি খারাপ কথা বলি, মিথ্যা বলি, গালাগালি করি ফেরেশতা লিখে ফেলবে; এগুলো সব আমলনামায় জমা হয়ে থাকবে? আর যদি আল্লাহর যিকির করি, দাওয়াত দেই, শিখি-শেখাই তা-ও ফেরেশতা লিখে নিবে? এ ধ্যান হওয়ার নাম ঈমান।

অনুরূপ দুইজন ফেরেশতা মানুষকে জিন ও বিভিন্ন বালা-মুসীবত থেকে হিফাযত করে। এরা সরে গেলেই মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। এরা নিরাপত্তার ফেরেশতা।

আরেকজন ফেরেশতা আছেন, যিনি শোয়ার সময় বলেন, নেকীর উপর ঘুমিয়ে পড়ো। পক্ষান্তরে শয়তান বলে, খারাবীর উপর ঘুমিয়ে পড়ো। কেউ যদি আল্লাহর যিকিরের সাথে ঘুমায় তাহলে নেকীর উপর ঘুমানো হলো। যদি দুনিয়ার যিকিরের সাথে ঘুমায় তাহলে খারাবীর উপর ঘুমানো হলো। কখনও কি আমাদের এরকম চিন্তা হয়? এ রকম চিন্তা হওয়া, এ রকম ধ্যান হওয়ার নাম ফেরেশতাদের উপর ঈমান।

এক ফেরেশতা পেটের ভেতরের খানা ও পানি আলাদা করার জন্য নিয়োজিত। খাদ্য-পানীয় এক নালী দিয়ে পেটে ঢুকলেও ওই ফেরেশতা সেগুলো খাদ্যনালী ও পানিরনালীতে আলাদা করে দেয়। আমাদের ইয়াকীনই নেই যে, এই কাজের জন্যও কোন ফেরেশতা আছে!

ঘরের দরজায় দাঁড়ানো থাকে এক ফেরেশতা ও এক শয়তান। দু'জনের হাতেই ঝাণ্ডা থাকে। বান্দার নামাযের দিকে গেলে ফেরেশতা ঝাণ্ডা নিয়ে মসজিদে পৌঁছে দেয়। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, ফেরেশতা ওই ব্যক্তির হাতে ঝাণ্ডা দিয়ে বলে, কল্যাণের সাথে পৌঁছে যাও। আর ঘুম থেকে উঠেই বাজারে গেলে শয়তান ঝাণ্ডা দিয়ে বলে বাজারে যাও...। ফেরেশতাদের ব্যাপারে এমন বিশ্বাস অর্জিত হলে আল্লাহ ঈমানকে কামেল করে দিবেন।

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস বর্ণনা করে ফেরেশতাদের গায়বী নেযামকে বুঝিয়েছেন– জনৈক ব্যক্তি নিরানব্বই জনকে হত্যা করে তওবা করার নিয়ত করল। এ উদ্দেশ্যে সে কোন এক আবেদের কাছে গেল। তাকে জিজ্ঞেস করল, আমি নিরানব্বই জনকে হত্যা করেছি, আমার তওবা কবুল হবে কি? যেহেতু সে আলেম ছিল না, জাহেল আবেদ ছিল, তাই জবাবে বলল, তোমার তওবা কবুল হবে না। আবেদের এই জবাবে নারায হয়ে লোকটা তাকেও কতল করে ১০০ (একশত) পুরা করল। তারপর তার দিলে আবারও তওবা করার অনুভূতি পয়দা হল। এবার সে এক আলেমের কাছে গিয়ে বিস্তারিত খুলে বলল। আলেম সাহেব তাকে জানালেন, আল্লাহ তা'আলা তওবার দ্বারা বড় বড় কুফরী গুনাহও মাফ করে দেন। কাজেই তুমি তওবা কর, আল্লাহ তা'আলার ক্ষমার প্রশস্তার তুলনায় তোমার গুনাহ কোন গুনাহই নয়। আলেম সাহেব আকলমন্দ ছিলেন। তিনি তাকে বললেন, তওবার ওপর অটল থাকার জন্য তোমাকে পরিবেশ বদলাতে হবে। সুতরাং তুমি অমুক এলাকায় গিয়ে তওবা করো, আশা করা যায়, সেই পরিবেশে তুমি তওবার ওপর অটল থাকতে পারবে। ওই ব্যক্তি আলেমের কথা মেনে সেই এলাকার দিকে রওনা হল। কিন্তু অর্ধেক পথ অতিক্রম করতেই মওতের ফেরেশতা হাজির। মালাকুল মওত বা মওতের ফেরেশতা রূহ কব্জা করেন, কিন্তু নিয়ে যান না। নিয়ে যান অন্য ফেরেশতারা। এবার তার রূহ নিয়ে যাওয়ার জন্য রহমত ও আযাবের ফেরেশতা আসল। এখন দুই ফেরেশতার মধ্যে ঝগড়া বাধল। দুই ফেরেশতার মধ্যে ফায়সালা করতে আল্লাহ তা'আলা আরেক ফেরেশতা পাঠালেন। সেই ফেরেশতা বলল, যমীন মেপে দেখো। মৃত ব্যক্তি যদি তার বাড়ি থেকে বেশি পথ অতিক্রম করে থাকে, তাহলে তার রূহ রহমতের ফেরেশতা নিবে। আর কম পথ অতিক্রম করে থাকলে আযাবের ফেরেশতা নিবে। এদিকে আল্লাহও তো মাফ করতে চান, রহম করতে চান, তওবা কবুল করতে চান। তাই তিনি যমীনকে হুকুম করলেন, হে ওই পথ! যা সে অতিক্রম করে এসেছে, দীর্ঘ হয়ে যাও। যমীন আল্লাহর হুকুমে দীর্ঘ হয়ে গেল। ফলে রহমতের ফেরেশতা তার রূহ নিয়ে গেলেন এবং সে জান্নাতী হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ।

হাদীসে পাকে এসেছে, রাতে ও দিনে আমল লেখার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতারা পালা বদল করে। একদল ফজরে আসে এবং আসরে চলে যায়। আরেক দল আসরে আসে এবং ফজরে চলে যায়। রাতের ফেরেশতারা যখন চলে যায়, আল্লাহকে বলে, গিয়ে দেখি আপনার বান্দা নামায পড়ছে। আবার আসার সময়ও দেখলাম সে নামায পড়ছে। অনুরূপ দিনের ফেরেশতা যখন আল্লাহর কাছে যায়, সাক্ষী হয়ে বলে, যখন তার কাছে গিয়েছি সে নামায পড়ছিল আবার যখন তার কাছ থেকে আসি, তখনও সে নামায পড়ছিল।

ফেরেশতাদের গায়বী নেযামের অধীনেই দুনিয়ার সবকিছু চলছে। মেঘের উপর, বাতাসের উপর, পানির উপর, আগুনের উপর ফেরেশতা মোতায়েন আছে। যে এলাকার লোকজন আল্লাহর ফরমাবরদারী করে, মেঘের ফেরেশতা সে এলাকায় ওই মেঘ হাঁকিয়ে নেয়, যে মেঘের বৃষ্টিতে বরকত থাকে। আর যে এলাকার লোকজন আল্লাহর নাফরমানী করে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা মারফত এমন বৃষ্টি পাঠান, যা ফল-ফসল বিনষ্ট করে দেয়।

আল্লাহ তা'আলা কখনও বায়ু প্রেরণ করেন, যার দ্বারা সুস্থতা ও প্রশান্তি লাভ হয়। আবার কখনও এত প্রবল বায়ু পাঠান, যা আযাব হয়ে আসে এবং সবকিছু বরবাদ করে দেয়। মোটকথা, সবকিছুর উপর ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছে।

আল্লাহই দুনিয়ার হালত পরিবর্তন করেন, কাউকে ইজ্জত দান করেন, আবার কাউকে বে-ইজ্জত করেন।

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থ: বল, হে আল্লাহ! হে সার্বভৌম শক্তির মালিক! তুমি যাকে চাও ক্ষমতা দান কর, আর যার থেকে চাও ক্ষমতা কেড়ে নাও। যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর এবং যাকে চাও লাঞ্ছিত কর। সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। (সূরা আলে ইমরান- ২৬)

আল্লাহ তা'আলার গায়বী নেযাম কেউ গণনা করতে পারে না, খাদ্যের প্রতিটি দানায় ফেরেশতা মোতায়েন থাকে, যতক্ষণ না সেই দানা নির্দিষ্ট ব্যক্তির পেটে যায়। বৃষ্টির প্রতিটা ফোঁটায় ফেরেশতা থাকে। কিছু ফেরেশতা আছে, যারা আল্লাহর আরশের চারদিকে তাওয়াফ করে। কিছু ফেরেশতা আছে বাইতুল মামুরে। বাইতুল মামুরে একেকবার ৭০ হাজার ফেরেশতা তাওয়াফ করে। কেয়ামত পর্যন্ত এক ফেরেশতা দ্বিতীয়বার তাওয়াফ করার সুযোগ পায় না। কোন ফেরেশতা কিয়াম করছে, কোন ফেরেশতা রুকুতে আছে, কোন ফেরেশতা সিজদা অবস্থায় আল্লাহর যিকির/তাসবীহ পাঠে রত আছে। ফেরেশতা, গাছপালা, নদী, সমুদ্র, জীব জানোয়ার সবাই তাসবীহ পাঠ করে। মানুষের ইবাদত এদের সবার ইবাদতের সমষ্টি।

ফেরেশতার উপর ঈমানের দাবী হল, আমি যখন আল্লাহর হুকুমের খেলাফ চলি, নবীর তরীকার খেলাফ চলি, তখন আমার ভেতর যেন ফেরেশতার বয়ে আনা আযাবের ভয় হয়।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, জলে-স্থলে যত ফিৎনা-ফাসাদ ও নৈরাজ্য-বিশৃঙ্খলা ঘটে সবই মানুষের দু'হাতের কামাই–

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

অর্থ : মানুষ নিজ হাতে যা কামায়, তার ফলে স্থলে ও জলে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে, আল্লাহ তাদেরকে তাদের কতক কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করাবেন সে জন্য; হয়ত (এর ফলে) তারা ফিরে আসবে। (সূরা রূম-৪১)

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

অর্থ : এবং সেই বড় শাস্তির আগে আমি তাদেরকে অবশ্যই লঘু শাস্তির স্বাদও গ্রহণ করাব। হয়ত তারা ফিরে আসবে। (সূরা সাজদাহ-২১)

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অর্থ : অতএব যারা তাঁর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের ভয় করা উচিত, না জানি তাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হয় অথবা যন্ত্রণাদায়ক কোন শাস্তি তাদেরকে আক্রান্ত করে। (সূরা নূর-৬৩)

উল্লিখিত আয়াতে নবীর খেলাফ চললে ফেৎনা পতিত করার ধমকি ও কঠিন আযাবের হুমকি দেয়া হয়েছে। এই আযাব ফেরেশতা নিয়ে আসে। আর যদি বান্দা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে এবং ভালো আমল করে তাহলে রহমত, বরকতও ফেরেশতারাই নিয়ে আসবে।

সুতরাং আল্লাহ ও রাসূলের ফরমাবরদারী করলে আমাদের যেন আশা সৃষ্টি হয় আর নাফরমানী করলে যেন ভয় সৃষ্টি হয়। একেই বলে ঈমান।

ওয়া কুতুবিহী

আসমান থেকে যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে সেটাই হলো সত্যিকারার্থে কামিয়াবী ও ব্যর্থতার মাপকাঠি। এ কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা। সর্বশেষ আসমানী কিতাব হলো কুরআন শরীফ। এতে সমস্ত আসমানী কিতাবের ইলম একত্র করা হয়েছে। সারা দুনিয়ার ইলম বাদ দিয়ে দাও, কোন সমস্যা নেই; এই কিতাবের ইলমই গোটা মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট।

অতঃপর কুরআনে যে আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করার কথা বলা হয়েছে, আমার আকীদা যদি তেমন হয়ে যায়; কুরআনে যে আখলাক-চরিত্র গঠন করার কথা বলা হয়েছে, আমার আখলাক যদি তেমন হয়ে যায়; কুরআনে ফরমাবরদারীর উপর যেসব ওয়াদা করা হয়েছে, সেসবের প্রতি যদি আমার ইয়াকীন জমে যায়; কুরআনে যে তাকওয়া-তাহারাত ও তাওয়াক্কুলের কথা বলা হয়েছে, আমার যদি তা হাসিল হয়ে যায়; কুরআনকে যদি আমি আমার শরীর ও জীবনে ধারণ করি তখন বলা যাবে, আমি আল্লাহর কিতাবের উপর ঈমান এনেছি; নচেৎ নয়।

কুরআনে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের যে বিবরণ পেশ করেছেন ওরকমভাবেই তা বিশ্বাস করা। কুরআনে জাহান্নামের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, সেভাবেই তা বিশ্বাস করা। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা আপন কুদরতের বর্ণনা দিয়েছেন, আপন সুন্নাতের বয়ান করেছেন, ফরমাবরদারী করা কামিয়াবী এবং নাফরমানীর উপর বালা-মুসীবত ও আযাব গযবের বর্ণনা দিয়েছেন। এগুলো সব মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা। কুরআনের উপর ইয়াকীন পুরা না হলে ইয়াকীন সহীহ হবে না।

ওয়া রুসুলিহী

ওয়া-রুসুলিহী মানে, রাসূলগণের উপর ঈমান আনা তথা আল্লাহর প্রেরিত সমস্ত নবী-রাসূলের উপর ঈমান আনা। নবী-রাসূলগণের সর্দার হলেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি খাতামুন্নাবিয়্যিন তথা সর্বশেষ নবী; তার পরে আর কোন রাসূলও আসবেন না, নবীও আসবেন না। যখন আমি নবী-রাসূলের সর্দার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনলাম, তখন তাকে মেনে চলতে হবে, তার তরীকা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে। যদি চলি, তাহলে দুনিয়ার আযাব থেকে বাঁচতে পারব। আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ থেকে বাঁচতে পারব। সব রকমের হালাকাত (ধ্বংস) থেকে বাঁচতে পারব। সবাই জুড়েমিলে ভাইভাই হয়ে থাকতে পারব। দুনিয়াবাসীর কাছে ইজ্জত পাব। আখেরাতেও ইজ্জত পাব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেলাফ হওয়া মানে, সমস্ত নবী-রাসূলের খেলাফ হওয়া। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এত্তেবা (অনুসরণ) মানে, সমস্ত নবী-রাসূলের এত্তেবা করা। আজ কত সুন্নাত আমাদের ঘরে মিটে যাচ্ছে। কত সুন্নাত খানা-পিনায় মিটে যাচ্ছে। কত সুন্নাত বিবাহ-শাদীতে মিটে যাচ্ছে। অথচ হাদীসে পাকে বলা হয়েছে, যে আমার সুন্নাতকে মহব্বত করল সে যেন আমাকেই মহব্বত করল এবং যে আমার সুন্নাতের এত্তেবা করল সে যেন আমাকেই মহব্বত করল। যতক্ষণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বাত কামেল না হয়, ঈমান কামেল হবে না। আর মুহাব্বত কামেল হয় রাসূলের এত্তেবা করার দ্বারা।

ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি

আখেরাতের দিনের উপর ঈমান আনা। আজ আমাদের আখেরাতের ভয় হয় না। আমাদের ঈমান ভয়হীন ঈমান। অথচ এটা চির সত্য যে, একদিন জান্নাত ও জাহান্নামকে নিকটে আনা হবে।

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ

অর্থ : মুত্তাকীদের জন্য জান্নাতকে নিকটে আনা হবে। যারা পথভ্রষ্ট হয়েছিল তাদের জন্য জাহান্নামকে নিকটে আনা হবে। (সূরা শুআরা-৯০,৯১)

একদিকে মুত্তাকীরা আরশের ছায়ায় বিশ্রাম নিবে, অন্যদিকে পাপিষ্ঠরা রোদের উত্তাপে পুড়তে থাকবে। একদিকে নবীর এত্তেবাকারীদের জন্য হাউজে কাউসার বরাদ্দ হবে, অন্যদিকে যারা এত্তেবা করেনি তাদের জন্য পুঁজ ও টগবগে গরম পানির ব্যবস্থা হবে। একদিকে নেককারগণ বিজলীর ন্যায় পুলসিরাত পার হবে, অন্যদিকে বদকারগণ পুলসিরাতের উপর থেকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

অর্থ : এমন লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা আল্লাহর স্মরণ, নামায কায়েম ও যাকাত দান থেকে গাফেল করতে পারে না, তারা ভয় করে সেই দিনকে, যে দিন অন্তর ও দৃষ্টি ওলট-পালট হয়ে যাবে। (সূরা নূর-৩৭)

যার জীবনে আখেরাতের ভয় যত বেশি হবে, তার ঈমান তত মযবুত ও শক্তিশালী হবে। আখেরাতের মঞ্জিল কবর থেকে শুরু হয়। সেই কবরের কথা বেশি বেশি স্মরণ করি, যেটা হয়তো জাহান্নামের গর্ত হবে নয়তো জান্নাতের টুকরা হবে। কারও কবর (জাহান্নামের গর্ত হলে) ফেরেশতার এক পিটুনীতে সে সত্তর হাত নীচে দেবে যাবে। কবর তাকে এমন চাপ দিবে, এক পাঁজড়ের হাড় অন্য পাঁজড়ে ঢুকে যাবে। হযরত উসমান রা. কবর দেখে কাঁদতেন। কবর আখেরাতের পহেলা মঞ্জিল। যে এখান থেকে রেহাই পেয়ে যাবে, সামনের সব মঞ্জিলে সে মুক্তি পাবে। আর এখানে যে আটকে যাবে, সামনের মঞ্জিলে তার আরও বেশি মুশকিল হবে। আজ আমার মধ্যে এই পহেলা মঞ্জিলের ব্যাপারে ভয় হয় না। কবরের ভয় দিলে পয়দা হলে ঈমান পাকা হবে। নয়তো ঈমান কমজোর হবে। এমন কমজোর ঈমান না গুনাহ থেকে বাঁচাবে, আর না নাফরমানী থেকে বাঁচাবে; বরং এমন ঈমানদার অন্যায় কাজে লিপ্ত হবে, যুলুম করবে, ফিৎনা-ফাসাদে লিপ্ত হবে। এমন ঈমানের কোন হাকীকত নেই, এটা তো স্রেফ আলফায।

ওয়াল কাদরি খাইরিহী ওয়া শাররিহী মিনাল্লাহি তা'আলা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

অর্থ: তোমার যা-কিছু কল্যাণ লাভ হয়, তা কেবল আল্লাহরই পক্ষ হতে আর তোমার যা-কিছু অকল্যাণ ঘটে, তা তোমার নিজেরই কারণে। (সূরা নিসা-৭৯)

যে বিপদ তাকদীরে (ভাগ্যলিপি) আছে তা ঘটবেই, কেউ ঠেকাতে পারবে না। যে কল্যাণ তাকদীরে আছে তা আসবেই, কেউ আটকাতে পারবে না। তাকদীরের উপর ঈমান আনা, ইয়াকীন করা জরুরী। সমস্ত মাখলুক মিলে উপকার করতে চাইলে পারবে না। আবার সমস্ত সৃষ্টজগত মিলে ক্ষতি করতে চাইলেও পারবে না। তাকদীরে বিশ্বাস দ্বারা ঈমান কামেল হয়। তাকদীরে বিশ্বাস ছাড়া ঈমান কামল হয় না।

(৩৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

স·ম·সা·ম·য়ি·ক প্রসঙ্গ

বৈশাখী কালচার : শেকড়ের সন্ধানে

মাওলানা হাফিজুর রহমান

সূচনা কথা

কালচার ও রিলিজন। এ দুইয়ের পারস্পরিক সম্পৃক্তি আছে কি নেই, বিভিন্ন বলয়ে এ নিয়ে নানা কথার উদ্‌গীরণ হয়। সংস্কৃতিকাতুরে কিছু মানুষ সংস্কৃতিকে স্বতন্ত্র একটি ধর্মের রূপ দিতে চান, 'দীনে ইলাহী'র মত যেখানে সকল ধর্ম-পেশার মানুষ একাকার হয়ে যাবে। সংস্কৃতিপন্থীদের প্রতিপাদ্য দাবি হলো, সংস্কৃতিকে প্রচলিত ধর্মের মত করে শ্রেণীবদ্ধ করে ফেলা যাবে না। একে সর্বজনীনতার রূপ দিয়ে পালন করতে হবে। এ দেশীয় কথিত সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পহেলা বৈশাখ এক আলোচিত নাম। বলা চলে, সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রধানতম আসনটিই অলঙ্কৃত করে আছে এ পহেলা বৈশাখ। পহেলা বৈশাখের মত এ সাংস্কৃতিক যজ্ঞের সাথে ধর্মীয় সম্পৃক্তি আছে কি নেই? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে একটু গভীরে যেতে চেষ্টা করবো।

বৈশাখ নামের ব্যবচ্ছেদ

বৈশাখ এখন একটি নাম। এ নামে আপাতত আমাদের আপত্তি থাকার কথা নয়। নাম সে তো নামই। পরিচয়ের মাধ্যম। কোনো কিছুর পরিচয় তুলে ধরতে নামের জুড়ি নেই। নামকরণে অবশ্য আবেগ, অনুভূতি, বিশ্বাস ইত্যাকার নানা বিষয়-আশয়ের বিরাট দখল থাকে। কখনো আবার অপরিকল্পিতভাবেই কোনো নামের সৃষ্টি হয়। সনাতনী ধর্মাবলম্বীদের বিশেষ ধর্মীয় শব্দ যোগে আমাদের দেশে জায়গা-অঞ্চলগত নামের অভাব নেই। কারণ ইতিহাস বলে, এ অঞ্চল একসময় সনাতনী ধর্মাবলম্বীদের অভয়ারণ্য ছিল। এ দেশের সিংহভাগ মুসলিমের বংশলতিকা ধরে এগোতে থাকলে একসময় সনাতনী কিংবা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের নাম চলে আসবে। এ কারণে ভারতে 'ঘর ওয়াপসি' নামে একটি গ্রুপ দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তারা বলে, মুসলিম! তুমি তো আমাদের। তুমি আপন ঘরে চলে এসো। মুসলিমদেরকে আপন (?) ঘরে ফিরিয়ে নিতে বেশ কসরত করে যাচ্ছে তারা। মুসলিমরা আঁধার থেকে আলোর পথে এসেছে। আবার আঁধারে ফিরে যাবে? মুসলিমরা এতোটা বোকা হয়তো এখনো হয়নি। আমরা অবশ্য তাদের সাথে সহমত পোষণ করে আরেকটি ঘর ওয়াপসি গ্রুপ দাঁড় করাতে পারি। সেখানে আমরা খুব সহজেই বলতে পারি, এ পৃথিবীর সকল মানুষ আদমের সন্তান। আদম আলাইহিস সালামই হলেন আমাদের আসল ঠিকানা, আসল ঘর। চলো আমরা সে ঘরেই ফিরে যাই!

বৈশাখ খণ্ডিত কিছু সময়ের একটি নামমাত্র। বৈশাখ নামের যে সময়গুলো চলে যায় তা আর ফিরে আসে না। শুধু নামটি পরবর্তীতে আসা কিছু খণ্ডিত সময়ের সাথে যুক্ত হয়। বৈশাখ নামকরণে সনাতনী ধর্মাবলম্বীদের ঘরোয়া বিশ্বাসের ছাপ পড়েছে নিবিড়ভাবে। কারণ বৈশাখ মানে বিশাখা সম্বন্ধীয়। বিশাখার আভিধানিক অর্থ কাণ্ড বা শাখাহীন বৃক্ষ। হিন্দু দেবতা ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ। এ দক্ষের কন্যা হলো বিশাখা। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের এ বিশাখা দেবীর নাম থেকেই বৈশাখ নামের সৃষ্টি। অন্য একটি সূত্র মতে বিশাখা বুদ্ধের বিশিষ্ট এক নারী শিষ্যের নাম। হতে পারে এ নাম হতে বৈশাখ নামের সৃষ্টি। এখন 'এসো হে বৈশাখ!' বলে শুধু নতুন একটি মাসকে আহ্বান করা হচ্ছে, নাকি বিশাখা দেবী বা দেবী বিষয়ক কোনো কিছুকে আহ্বান করা হচ্ছে সেটা বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন। এসো হে বৈশাখ... কবিতার রচয়িতা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ব্রহ্ম ধর্মালম্বী ছিলেন। তিনি তার বিশ্বাস নিয়ে কবিতা লিখেছেন এবং বৈশাখকে ডেকেছেন। কিন্তু একজন অমুসলিম কবির ধর্মীয় বোধ-বিশ্বাস থেকে উৎসারিত কবিতা তো আমরা মুসলিমরা পাঠ করতে পারি না!

মঙ্গলশোভাযাত্রা আসলে কী?

মঙ্গলশোভাযাত্রা এখন পহেলা বৈশাখের প্রধানতম অনুষঙ্গ। একসময় পহেলা বৈশাখে এর সংযুক্তি দৃশ্যমান ছিলো না। তখন ব্যবসাকেন্দ্রিক পহেলা বৈশাখের একটা রূপ দেখা যেত। নগরকেন্দ্রিক এর স্বতন্ত্র কোনো বহিঃপ্রকাশ ছিলো না। কিন্তু এখন আমরা পহেলা বৈশাখ কেন্দ্রিক মঙ্গলশোভাযাত্রা নামে বড় ধরনের একটা আপত্তিকর আয়োজন প্রত্যক্ষ করি। এ সংযুক্তি কেন? কোথা থেকে এলো?

এক. মঙ্গল শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে- (ক) কল্যাণ, (খ) সপ্তাহের চতুর্থ দিবসের নাম, (গ) সৌরজগতের একটি গ্রহের নাম। সাধারণত মঙ্গলের এ তিনটি অর্থই ব্যবহৃত হয়। তবে মঙ্গল শব্দটির শক্তিশালী একটি ধর্মীয় দিকও রয়েছে। সনাতনী ধর্মাচারে মঙ্গল শব্দের বহু কীর্তি বিদ্যমান। এবার দেখা যাক, হিন্দু ধর্মাচারে মঙ্গল শব্দের ধর্মীয় রূপ কী?

১। মূর্তিপূজক সম্প্রদায়ের নিকট মঙ্গল নামে একজন দেবতা রয়েছে। মঙ্গল হলো, যৌনতা, যুদ্ধ এবং শক্তির দেবতা।

২। হিন্দু ধর্মের মধ্যযুগীয় আখ্যানকবিতাকে মঙ্গলকাব্য নামে অভিহিত করা হয়। যে কাব্যে দেবতাদের আরাধনা হয়, মাহাত্ম্য ও গুণকীর্তন হয়, যে কাব্য শ্রবণে মঙ্গল হয় এবং যে কাব্য গৃহে রক্ষিত হলে মঙ্গল সাধিত হয় তাকেই মঙ্গলকাব্য নামে অভিহিত করা হয়। মঙ্গলকাব্য আবার তিন শাখায় বিভক্ত। মনসামঙ্গল, চণ্ডিমঙ্গল ও অন্যদামঙ্গল।

৩। পূজার সময় যে পাত্র ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় মঙ্গলঘট।

৪। বিশেষ পূজার জন্য যে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয় তাকে বলা হয় মঙ্গলপ্রদীপ।

৫। পূজার সময় মঙ্গলপ্রদীপ ঘুরিয়ে যে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটানো হয় তাকে বলা হয় মঙ্গল আরতি।

৬। হিন্দু ধর্মাচারে বিশেষ একটি পূজা রয়েছে যার নাম মঙ্গলপূজা।

৭। হিন্দু ধর্মে বিবাহের প্রথম আচারের নাম হলো মঙ্গলাচরণ।

৮। হিন্দু ধর্মে বিবাহকালে সূর্যোদয়ের পূর্বে বর-কনেকে চিড়ে ও দধি আহার করানো হয়, যাকে দধিমঙ্গল নামে অভিহিত করা হয়।

৯। হিন্দু ধর্ম মতে বিপদ হতে রক্ষাকামনায় প্রিয়জনের মণিবন্ধে যে সূতা বেঁধে দেয়া হয় তাকে বলা হয় মঙ্গলসূত্র বা রাখি।

১০। সনাতনী ধর্মাবলম্বীদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে যে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় তাকে বলা হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা।

দুই. শোভা অর্থ সৌন্দর্য, কান্তি, বাহার, সৌন্দর্যের বা উজ্জ্বলতার বিকাশ।

তিন. যাত্রা অর্থ গমন, প্রস্থান, নির্গমন, অতিবাহন, যাপন, নির্বাহ, দেবতার উৎসবাদি। শোভাযাত্রা মানে বহুলোকের একত্রে সমারোহের সহিত গমন।

যাত্রা শব্দটির আভিধানিক অর্থের মাঝেই হিন্দুধর্মীয় ভাবার্থ বিদ্যমান। উইকিপিডিয়া যাত্রা শব্দটির ধর্মীয় রূপটিকে আরো পরিষ্কার করে দিয়েছে। উইকিপিডিয়া বলছে, যাত্রা শব্দের ইংরেজি রূপ হলো Yatra। সংস্কৃতি ভাষায় বলা হয় যাত্রা। বাংলায় আমরা লিখি যাত্রা। যাত্রার সংজ্ঞায় উইকিপিডিয়া বলছে, Yātrā (Sanskrit: যাত্রা, 'journey', 'procession', in Hinduism and other Indian religions, generally means pilgrimage to holy places such as confluences of sacred rivers, places associated with Hindu epics such as the Mahabharata and Ramayana, and other sacred pilgrimage sites. (https://en.wikipedia.org/wiki/Yatra)

অর্থাৎ যাত্রা শব্দটি ব্যবহৃত হয় সনাতনী ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় কোনো কাজে গমনার্থে। সুতরাং মোটামুটি নিশ্চিত করেই বলা যায়, মঙ্গলশোভাযাত্রা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটি বিশেষ ধর্মীয় অনুষঙ্গ। মিডিয়ায় সনাতনী ধর্মাবলম্বীদের মঙ্গলশোভাযাত্রার বহু চিত্র প্রত্যক্ষ করা যায়। তাতে সম্মুখ ভাগের ব্যানারে লেখা থাকে, 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে মঙ্গলশোভাযাত্রা'। সচেতন বোদ্ধাদের বোধ হয় অতিরিক্ত আর প্রমাণের প্রয়োজন হবে না। (https://www.facebook.com/noyonchatterjee5/ posts/352298235171846) এসব সূত্র সামনে রেখে কি বলা সম্ভব মঙ্গলশোভাযাত্রা একটি অসাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান?

মঙ্গলশোভাযাত্রায় বাঘ-পেঁচার মূর্তি

অনেকে বলেন, মঙ্গলশোভাযাত্রায় ব্যবহৃত নির্দিষ্ট পশু-পাখির প্রতীকগুলো এ দেশের ন্যাশনালিটি ধারণ করে। আসলে কি তাই? ঢাবির চারুকলা অনুষদের ডিন ড. নিসার হোসেন দৈনিক সমকালে দেয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ১৯৮৯ সালের প্রথম শোভাযাত্রার ঘোড়া ও বিশাল বাঘের মুখ এবারের শোভাযাত্রায় থাকছে। থাকছে সমৃদ্ধির প্রতীক হাতি। (http://bit.ly/2nMISkj) ডিন মহোদয় বলছেন, হাতি হচ্ছে সমৃদ্ধির প্রতীক। আর আমরা বলছি, না, এটা আবহমান গ্রাম বাংলার প্রতীক। কারটা সত্য? ভারতীয় (http://bit.ly/2nsiHvU) এ লিংকটিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, হিন্দু ধর্ম মতে গনেশ তথা হাতি হচ্ছে সমৃদ্ধির প্রতীক। (https://www.facebook.com/noyonchatterjee5/photos/a.296717957396541.1073741828.249163178818686/353737258361277/?type=3&theater)

১৪.৪.'১৪ ইং তারিখে 'লক্ষ্মীপেঁচায় সমৃদ্ধি, গাজী ও বাঘ দুঃসময়ের কাণ্ডারী' শিরোনামে bdnews24.com এর অনলাইন পোর্টালে একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়। সেখানে বলা হয়েছে, লোকজ ঐতিহ্যের নানা প্রতীক নিয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রত্যাশায় করা এই শোভাযাত্রায় স্থান পেয়েছে- মা ও শিশু, হাঁস ও মাছের ঝাঁক, বিড়ালের মুখে চিংড়ি, শখের হাঁড়ি। মঙ্গলযাত্রায় ছিল হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের দুঃসময়ের কাণ্ডারীর প্রতীক হিসেবে 'গাজী ও বাঘ', সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে লক্ষ্মীপেঁচার পাশাপাশি শিশু হরিণ, মা ও শিশু, হাঁস ও মাছের ঝাঁক।

প্রতিবেদনটিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, সমৃদ্ধির প্রতীক হলো লক্ষ্মীপেঁচা। এর উপস্থাপনভঙ্গিতে প্রতীয়মান হয়, মঙ্গলশোভাযাত্রা একটি প্রার্থনামূলক ইবাদত। যাতে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ কামনা করা হয়।

একদিকে বলা হচ্ছে, এগুলো গ্রাম বাংলার লোকজ সংস্কৃতির ধারক। অন্যদিকে বলা হচ্ছে সমৃদ্ধির প্রতীক। যদি ধরে নেই, এগুলো গ্রাম বাংলার সংস্কৃতির ধারক তাহলে কথা হলো, আমাদের গ্রাম-বাংলায় একটা কুসংস্কার চালু আছে, 'পেঁচা কুলক্ষণ বহন করে।' এতে দেখা যাচ্ছে, পেঁচা এটা গ্রাম বাংলার কুসংস্কৃতির ধারক। কুসংস্কৃতি কি কোনো প্রচারের বিষয় হলো? আর যদি বলি, পেঁচা সুলক্ষণ ও সমৃদ্ধির প্রতীক তাহলে বলবো, এটা হিন্দু বিশ্বাস। মুসলিম বিশ্বাসে এসবের কোনো স্থান নেই। কারণ হিন্দু বিশ্বাস মতে লক্ষ্মী দেবীর বাহন হলো পেঁচা। সে পেঁচা নাকি মঙ্গল ও সমৃদ্ধি বহন করে। সুতরাং এতে প্রতীয়মান হচ্ছে, মঙ্গলোশোভাযাত্রা ও তাতে ধারণকৃত মূর্তি মুখোশ সবই ভিনদেশীয় ও ভিনধর্মীয় সংস্কৃতি। এগুলোর সাথে বাংলাদেশ ও মুসলিমদের কোনো সম্পর্ক নেই।

(https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article772232.bdnews)

মঙ্গলশোভাযাত্রায় ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মূর্তি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। অথচ ক্ষ্যাপা ষাঁড় শিবের বাহনগত প্রতিকৃতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মঙ্গলশোভাযাত্রায় বাঘের মূর্তি-মুখোশ অতিমাত্রায় ব্যবহৃত হয়, যা দূর্গার বাহনগত প্রতিকৃতির নির্দেশ করে। একই সাথে হাতিও অতিমাত্রায় ব্যবহৃত হয় যা গণেশ দেবতা নির্দেশ করে। গণেশকে মঙ্গলমূর্তি হিসেবে বিশ্বাস করে হিন্দুরা। সে হিসেবে মঙ্গল শোভাযাত্রায় গনেশের প্রতিকৃতি থাকা অত্যাবশ্যক পর্যায়ের।

এছাড়া মঙ্গলশোভাযাত্রায় সূর্যের প্রতিকৃতি (মানুষের মাথার মত) অনেক বেশি দেখা যায়। এটা হচ্ছে হিন্দুদের সূর্য দেবতার প্রতিকৃতি। উইকিপিডিয়া বলছে- সূর্য হিন্দুধর্মের প্রধান সৌর দেবতা। হিন্দু ধর্মীয় সাহিত্যে সূর্যকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে। কারণ সেই একমাত্র দেবতা যাকে মানুষ প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করতে পারে।

(https://bn.wikipedia.org/wiki/সূর্য দেবতা)

মঙ্গলশোভাযাত্রায় ব্যবহৃত এসকল প্রতিকৃতি হিন্দুধর্মীয় সংস্কৃতি থেকে এসেছে। এ সম্পর্কে নিউইয়র্ক ইউনিভির্সিটি থেকে প্রকাশিত সালেক খান রচিত Title Performing the (imagi) nation: A Bangladesh Mise-en-scene নামক বইয়ের ২১৬ পৃষ্ঠায় মঙ্গলশোভাযাত্রা সম্পর্কে বলা আছে- People Marching in the parade also carry paiper mache portrits Depicting mythical figures and animals. These caracters Are taken from Hindu puja and rituals.

অর্থাৎ মঙ্গল শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত নানা প্রকারের মূর্তিগুলো হিন্দুদের পূজা অনুষ্ঠান থেকে ব্যবহার করা হয়েছে।

মঙ্গলশোভাযাত্রার ইতিকথা

মঙ্গলশোভাযাত্রার সূচনা হয় ১৯৮৯ সালে। নামকরণ হয় ১৯৯৬ সালে। প্রশ্ন হলো, চারুকলা কেন এ আয়োজনের সূচনা করলো? এবং সেটা বছরের সূচনা দিনে করতে হবে এ তত্ত্ব চারুকলা কোথায় পেল? গ্রামবাংলায় কি পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে এ ধরনের শোভাযাত্রার আয়োজন হতো? ইতিহাস তো এ প্রশ্নের ইতিবাচক কোনো উত্তর দেয় না। তবে চারুকলা এ ব্যাপারটিতে কেন এতো প্রাগ্রসর হলো? অতীতে গ্রামবাংলার কোথাও যদি এ ধরনের আয়োজন না হয়ে থাকে তাহলে সেটা তো বাংলার সংস্কৃতি হতে পারে না। চারুকলার নিজস্ব সংস্কৃতি হতে পারে। যদি

প্রমাণিত হয় গ্রামবাংলায় এ ধরনের শোভাযাত্রার আয়োজন হয়েছে তবে প্রশ্ন হবে সেটা কোন সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি হিসেবে পালিত হয়েছে? অনলাইন তথ্য বলছে, বছরের প্রথম দিন এভাবে শোভাযাত্রার আয়োজন করার কালচার ভারতের মারাঠী হিন্দুদের মাঝে চালু আছে। তাদের অনুষ্ঠানটির নাম Gudi Padwa (https://en.wikipedia.org/wiki/Gudi_Padwa) এছাড়া ভারতীয় অন্যান্য জাতিসত্তার মাঝেও বছরের প্রথম দিন শোভাযাত্রা বের করার নিয়ম চালু আছে। তবে সেগুলো কোন না কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক।

সংস্কৃতি কাকে বলে?

একটা জাতির দীর্ঘদিনের জীবনাচরণের ভেতর দিয়ে যে মানবিক মূল্যবোধ সুন্দর ও কল্যাণের পথে এগিয়ে চলে তাই সংস্কৃতি। বিভিন্ন আচার-প্রথা, নিয়ম কানুন, বিশ্বাস সবই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কোনো বিষয় কোনো সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি হয়ে উঠতে হলে তার অস্তিত্ব ওই সম্প্রদায়ের মাঝে বিদ্যমান থাকতে হবে। অতএব মঙ্গলশোভাযাত্রার নামে বর্তমানে যা কিছুর আয়োজন হচ্ছে তার কোন সূত্রই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বাঙ্গালী বা মুসলিম জাতিসত্তার মাঝে। তাহলে এটাকে কি করে গ্রহণীয় সংস্কৃতি হিসেবে অভিহিত করা যায়?

ভুল পথে মঙ্গলশোভাযাত্রার ইউনেস্কো যাত্রা!

ইউনেস্কোতে জায়গা করে নিতে সত্য মিথ্যা ও নীতিনৈতিকতার কোনো বালাই নেই। যে কোনো উপায়ে চমকে দেয়া কিছু পারফরমেন্স প্রেজেন্টেশন করতে পারলেই হলো। বেচারা মঙ্গলশোভাযাত্রা ইউনেস্কোতে প্রবেশাধিকার পেয়েছে। কিন্তু ইউনেস্কো মহোদয় তার জন্ম তারিখে গলদ করে ফেলেছেন। ভুল তথ্যের উপর ভিত্তি করে কথিত মঙ্গল শোভাযাত্রাকে ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে জাতিসংঘের ইউনেস্কো। ইউনেস্কো কেন মঙ্গল শোভাযাত্রাকে Intangible Cultural Heritage হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য বয়ান করতে গিয়ে বলেছে, `the tradition of Mangal Shobhajatra began in 1989 when students, frustrated with having to live under military rule, wanted to bring people in the community hope for a better future.` (http://bit.ly/2oBrEnF) অর্থাৎ এরশাদের মিলিটারি রুলের কারণে ছাত্ররা হতাশাগ্রস্ত ছিলো। ফলে ভবিষ্যত মঙ্গল কামনায় তারা এই মঙ্গলশোভাযাত্রার সূচনা করে।

কিন্তু ইউনেস্কো পরিবেশিত এ তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। ইতিহাস বলছে, ১৯৮৯ সালে চারুকলার উদ্যোগে কথিত এই শোভাযাত্রা যখন শুরু হয়, তখন তার নাম মঙ্গলশোভাযাত্রা ছিলো না, ছিলো বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা। মঙ্গলশোভাযাত্রা নামকরণ করা হয় ১৯৯৬ সালে। তখন মোটেও মিলিটারি শাসন ছিলো না, ছিলো গণতান্ত্রিক সরকার। (http://bit.ly/2nCQDJG,)

হালখাতা পূজা একটি হিন্দুধর্মীয় অনুষ্ঠান

আমাদের দেশের কর্ণধারগণ বলেন, নববর্ষ উদযাপন বিষয়টি মূলত ব্যবসা-বাণিজ্যে আমাদের অতীতের পণ্য বিনিময় ব্যবস্থা থেকে এসেছে। এর সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। সম্পর্কটা সংস্কৃতির। তারা একথা বলে মূলত বর্ষবরণ থেকে সব ধরণের ধর্মীয় সম্পৃক্তিকেই নাকচ করতে চাচ্ছেন।

এবার লক্ষ্য করুন বর্ষবরণের সাথে হিন্দুধর্মের সম্পৃক্তি

হালখাতা অনুষ্ঠানের নামে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান মূলত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পূজা অনুষ্ঠান। যাকে হালখাতা পূজা বা নতুন খাতা পূজা নামে অভিহিত করা হয়। হিন্দু ধর্মগ্রন্থে পূজার লিস্টে হালখাতা পূজাও বিদ্যমান রয়েছে। হিন্দুদের নিকট হালখাতা পূজা অনুষ্ঠানে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা করা অবশ্য কর্তব্য। এমনকি এ পূজার সময় কী মন্ত্র পাঠ করতে হয় তাও সুনির্দিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের জীবনীগ্রন্থেও হালখাতা পূজার বিবরণ পাওয়া যায়।

উইকিপিডিয়া বলছে, বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে 'পহেলা বৈশাখ' দিনটি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় উৎসবের মধ্য দিয়ে পালিত হয়। কলকাতার কালীঘাট মন্দির ও দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে এই দিন প্রচুর পূণ্যার্থী পূজা দেন এবং ব্যবসায়ীরা লক্ষ্মী-গণেশ ও হালখাতা পূজা করেন। (https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%96)

এবার লক্ষ্য করা যাক বর্ষবরণের সাথে ইসলামের সম্পৃক্তি

বর্ষবরণের নামে কথিত এসব আনুষ্ঠানিকতার সাথে ইসলামের ইতিবাচক কোনো সম্পৃক্তি নেই। তবে নেতিবাচক সম্পৃক্তি আছে। ইসলাম এমন একটি সর্বজনীন ও সর্বব্যাপী আদর্শ যা সর্ববিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের একচেটিয়া অধিকার রাখে। বর্ষবরণের গতি-পথ, নৈতিকতা-অনৈতিকতা এবং বৈধতা-অবৈধতা নিয়ে কথা বলতে ইসলাম বাধ্য। সুতরাং ইসলাম পহেলা বৈশাখের নামে প্রচলিত বর্ষবরণের এটুজেড বিশ্লেষণ করে নীতিনির্ধারণীমূলক কথা বলবে এবং বলতেই হবে। এটা ইসলাম ও ইসলামের ধারক-বাহকদের নৈতিক দায়বদ্ধতা। পহেলা বৈশাখে নারী পুরুষের অবাধ চলাচল হয়। এ বিষয়ে কি ইসলামের বিধিনিষেধ নেই? পহেলা বৈশাখে পর্দাবিধান চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়। এ ব্যাপারটিতে কি ইসলামে কোনো কথা বলা নেই? পহেলা বৈশাখে চরম আপত্তিকর পোশাকের প্রদর্শনী হয়। এ ব্যাপারে কি ইসলাম কথা বলে না? পহেলা বৈশাখে জীবচিত্র ধারণ করা হয়। এ ব্যাপারে কি ইসলাম নীরবতা পালন করে? পহেলা বৈশাখে ভিন্ন ধর্মের সাথে সাদৃশ্য অসংখ্য ধর্মীয় সংস্কৃতি লালন করা হয়। এ ব্যাপারে কি ইসলাম কিছুই বলে না? তবে এর সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই- এ কথার কি ব্যাখ্যা? সুতরাং পহেলা বৈশাখের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই- কথাটা সর্বৈব অপাংক্তেয় ও ভঙ্গুর।

মহাভারতে মঙ্গলযাত্রা

মহাভারত হিন্দুদের প্রধানতম ধর্মগ্রন্থ। তাতে তাদের ধর্মাচারের অনেক কিছুই বিবৃত হয়েছে। রাষ্ট্রের উঁচু স্তর থেকে অবিরাম প্রচারণা চলে, মঙ্গলশোভাযাত্রা হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতির অংশ নয়। এটি একটি অসাম্প্রদায়িক উৎসব। অথচ মঙ্গলযাত্রার কথা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ মহাভারতে রয়েছে। মহাভারতের দ্বিতীয় খণ্ডের ১০১ পৃষ্ঠায় মঙ্গলযাত্রা করার নির্দেশ দেয়া আছে। (http://bit.ly/2pauCn8) উপরন্তু ১৩-১৫ই এপ্রিল অনেক দেশেই বর্ষবরণ পালিত হয়। তবে সবগুলোই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। কোথাও বৌদ্ধ ধর্মীয়, কোথাও হিন্দু ধর্মীয় আবার কোথাও শিখ ধর্মীয়। ইসলামের সাথে এর বিন্দুমাত্র সংযুক্তি নেই। তা সত্ত্বেও আমরা বলতে থাকি যে, পহেলা বৈশাখ অসাম্প্রদায়িক উৎসব! বাঙ্গালীর প্রাণের উৎসব!! (https://en.wikipedia.org/wiki/Vaisakhi)

রবী ঠাকুরের জীবনে পহেলা বৈশাখ পূজা

'এসো হে বৈশাখ! এসো এসো' কবিতাটি একশ্রেণীর মানুষের পূজনীয় কোরাসে পরিণত হয়েছে। কতটা মমতা দিয়ে তারা কবিতাটি আবৃত্তি করে! কিন্তু তারা আদৌ চিন্তা করে না, এ কবিতাটি

কে রচনা করেছে? কি বিশ্বাসে রচনা করেছে? কবিতাটির রচয়িতা রবী ঠাকুর বেশ মমতা ভরে বৈশাখী পূজা পালন করতেন। 'রবী জীবনী'র সপ্তম খণ্ডে রবীন্দ্র জীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন, 'ওই বৎসর নববর্ষের দিনটি রবীন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতনে ছিলেন, তাই প্রথানুযায়ী ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে মন্দিরে উপাসনা করে বর্ষবরণ করেন।' এরপর উক্ত গ্রন্থের ২৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ষশেষের উপাসনার কথা আছে। প্রশান্ত কুমার পাল লিখেছেন, '৩১ চৈত্র (শুক্র, ১৩ এপ্রিল) সন্ধ্যায় কলকাতার বহু অতিথি এবং ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বর্ষশেষের উপাসনা করেন।' এতে দেখা যাচ্ছে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পহেলা বৈশাখকে পূজা হিসেবে পালন করতেন। সেখানে আজকে রবীন্দ্রভক্তরা কোন যুক্তিতে এই দিবস পালনকে সেক্যুলার হিসেবে দাবি করে বুঝে আসে না। তিনি তার কবিতায় কোন বিশ্বাসে বৈশাখকে আহ্বান করেছেন তা কি আর বলে বুঝানোর প্রয়োজন আছে?

নববর্ষ পালনে দুঃখ-কষ্ট মুছে যাবে?

অগ্নি উপাসক, হিন্দু, বৌদ্ধ ও উপজাতিদের বিশ্বাস হলো, এভাবে বছরের প্রথম দিনটি পালন করা হলে সারা বছরের জরা-দুঃখ-কষ্ট সব মুছে যাবে। বৌদ্ধরা বিশ্বাস করে পানি দিয়ে বৈসাবী খেললে জরা-দুঃখ দূরীভূত হয়ে তারা শুদ্ধ হয়ে যাবে। অগ্নি উপাসকদের বিশ্বাস হলো, আগুন তাদের জরা-দুঃখ মুছে শুদ্ধ করে দেবে। এই বিশ্বাস হিন্দুদের মাঝেও সংক্রামিত। তাই দেখা যায়, পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে যে গানটা গাওয়া হয় তাতে একটা পঙ্ক্তি আছে- 'মুছে যাক গ্লানি ঘুঁচে যাক জরা, অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা'। পঙ্ক্তিটিতে স্পষ্টই বলা হচ্ছে, আগুন দিয়ে শুদ্ধ হওয়া যাবে। বস্তুত নববর্ষ অগ্নি-উপাসকসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অনুষ্ঠান হওয়ার কারণেই প্রকৃত ইসলামীবেত্তারা কখনই এ অনুষ্ঠান পালনে অনুমতি বা স্বীকৃতি দেননি।

মঙ্গলশোভাযাত্রা কি আসলে ঐতিহ্যের পর্যায়ে পড়ে?

২৭ বছর আগে, ১৯৮৯ সাল থেকে মঙ্গলশোভাযাত্রার সূচনা হয়। এত অল্প সময়ে কি কোনো কিছু ঐতিহ্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে? ঐতিহ্যের মাঝে কি সময়ের ব্যবধান এতোটাই সংকীর্ণ। একটা প্রজন্ম পার না হতেই তা ঐতিহ্যের রূপ নিলো! তবে এটা হিন্দুয়ানী ঐতিহ্যের পর্যায়ভুক্ত হতে পারে। কারণ তারা এটাকে সম্ভবত বহুকাল ধরেই পালন করে আসছে। সুতরাং মঙ্গলশোভাযাত্রা হিন্দুধর্মীয় ঐতিহ্য হতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালী বা বাংলাদেশী ঐতিহ্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

নববর্ষে আরো যেসব পূজা উৎসব পালিত হয়

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে পহেলা বৈশাখে অনেক পূজা পার্বণই পালন করা হয় হিন্দু বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে। যথা :

১. হিন্দুদের ঘটপূজা, গণেশ পূজা, সিদ্ধেশ্বরী পূজা, ঘোড়ামেলা, চৈত্রসংক্রান্তি পূজা-অর্চনা, চড়ক বা নীল পূজা বা শিবের উপাসনা ও সংশ্লিষ্ট মেলা, গম্ভীরা পূজা, কুমীর পূজা, অগ্নিনৃত্য, বউমেলা, মঙ্গলযাত্রা এবং সূর্যপূজা।

২. ত্রিপুরাদের বৈশুখ মারমাদের সাংগ্রাই ও পানি উৎসব।

৩. চাকমাদের বিজু উৎসব (ত্রিপুরা, মারমা ও চাকমাদের পূজা উৎসবগুলোর সম্মিলিত নাম বৈসাবি)।

৪. হিন্দু ও বৌদ্ধদের উল্কিপূজা।

৫. অগ্নি পূজকদের নওরোজ।

সুতরাং পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে যত আয়োজন সবই ভিন্ন ধর্মালম্বীদের। মুসলমানদের এখানে কিছুই নেই। অতএব মুসলমানরা পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে কোনো পূজা করতে পারে না। নাম তার যাই হোক।

পহেলা বৈশাখ তো মুসলমানরাই চালু করেছে!

অনেকে বলেন, পহেলা বৈশাখ অনুষ্ঠান মোঘল আমল থেকে চালু হয়েছে। বাদশাহ আকবার এটা চালু করেছে। সে মুসলিম ছিল। হিন্দুরা তো এটা চালু করেনি। সুতরাং মুসলমানদের চালু করা বিষয় অনুসরণ করতে মুসলমানদের সমস্যা কোথায়? বাহ্যত বেশ যৌক্তিক প্রশ্ন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বাদশা আকবর মুসলিম ছিলেন কিনা? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমরা নিম্নে তার কিছু কার্যক্রম ও ধারণা-বিশ্বাসের ফিরিস্তি তুলে ধরছি।

১. সম্রাট আকবর ইসলাম ধর্মের পরিবর্তে 'দীনে ইলাহী' নামে নতুন এক ধর্মের প্রবর্তন করেন। এই নতুন ধর্মের প্রধান উপাদান ছিল সূর্যের উপাসনা। বাদশাহ প্রভাতে, দ্বিপ্রহরে, সন্ধ্যায় ও অর্ধরাত্রে বাধ্যতামূলকভাবে সূর্য পূজা করতেন। তিনি তিলক লাগাতেন ও পৈতা পরতেন। সূর্যোদয়ের সময় ও মধ্যরাত্রিতে নহবত ও নাকাড়া বাজান হতো। এই নতুন ধর্মে সূর্যের নাম উচ্চারণকালে 'জাল্লাত কুদরাতুহু' বলা হতো। বাদশাহ বিশ্বাস করতেন, সূর্য রাজা-বাদশাহদের অভিভাবক ও হিতাকাঙ্ক্ষী। তিনি তাই হিন্দুদের কাছ থেকে সূর্যকে বশীভূত করার মন্ত্র শিখেছিলেন। মাঝরাত্রে ও ভোরে তিনি এই মন্ত্র পাঠ করতেন। শিবরাতে তিনি যোগীদের আসরে সমস্ত রাত্রি বসে থাকতেন এবং বিশ্বাস করতেন, এতে আয়ু বৃদ্ধি পায়।

২. গৌতম নামের জনৈক ব্রাহ্মণের কাছ থেকে বাদশাহ মূর্তি, সূর্য, আগুন, ব্রহ্মা, মহামায়া, বিষ্ণু, কৃষ্ণ ও মহাদেব পূজার কায়দা কানুন শুনে বড়ই উৎফুল্ল হতেন এবং এসব গ্রহণও করতেন। উপরন্তু এই ধর্মে আগুন, পানি, গাছ, গাভীরও পূজা করা হত। নক্ষত্র পূজার ব্যাপারেও বাদশাহ অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করতেন।

৩. হিন্দুদের পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করাও ছিল এই ধর্মের কর্তব্য। সম্রাট আকবর হিন্দুদের পূনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করতেন। মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় অন্য কোন সিংহাসনে আরোহন করবেন বলে বিশ্বাস করতেন। ব্রাহ্মণগণ তাকে বুঝিয়েছিল, শক্তিশালী বাদশাহর শরীরে আত্মার জন্ম হয় এবং মহা মনীষীগণের আত্মা মৃত্যুর সময় মস্তকের তালু দিয়ে বের হয়ে যায়। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি মাথার তালু টাক করে ফেলতেন এবং মস্তকের চারদিকে চুল রেখে দিতেন। বাদশাহ জৈন সাধুদের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। সাধু সঙ্গ লাভের পর হতে তার নিকট সব সময় এমনকি ভ্রমণের সময়েও একজন জৈন সাধু থাকত। জৈন ধর্ম অনুযায়ী বাদশাহ নিজেও গোশত ভক্ষণ ত্যাগ করেছিলেন।

৪. অগ্নিপূজকদের দ্বারাও বাদশাহ যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। তার আদেশে দরবারের সম্মুখে সর্বক্ষণ অগ্নি প্রজ্জ্বলনের ব্যাবস্থা করা হয়। ঘণ্টাধ্বনি প্রভৃতি গ্রহণ করা হয় খ্রিস্টানদের নিকট থেকে। মোটকথা ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্মই বাদশাহর চোখে সুন্দর মনে হত। তার চোখে সবচেয়ে বেশি সুন্দর মনে হতো হিন্দুধর্ম। তাই তার নতুন ধর্ম 'দীন-ই-ইলাহীর' বেশির ভাগ উপাদানই গৃহীত হয়েছিল হিন্দুধর্ম হতে। তাই সঙ্গত কারণেই হিন্দু এবং রাজপুতদের নিকটই এই অদ্ভুত ধর্ম সমাদর লাভ করেছিল সবচাইতে বেশি। সম্ভবত বাদশাহ আকবেরর কাম্যও ছিল তাই।

৫. দীন-ই-ইলাহীর মূলমন্ত্র ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাহ, আকবারু খলিফাতুল্লাহ'।

যারা নুতন এ ধর্মে দীক্ষিত হত তাদেরকে এরূপ শপথ বাক্য উচ্চারণ করতে হতো- 'আমি অমুকের পুত্র অমুক এতদিন বাপ-দাদাদের অনুকরণে ইসলাম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠত ছিলাম। এখন স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে পূর্বধর্ম পরিত্যাগ করে 'দীন-ই-ইলাহী' গ্রহণ করছি এবং এই ধর্মের জন্য জীবন, সম্পদ ও সম্মান বিসর্জন দিতে প্রস্তুত আছি।'

এছাড়া আরো অসংখ্য ইসলামবিরোধী কুফরী বিধান প্রচলিত ছিল বাদশাহ আকবরের দীনে ইলাহীতে। সুতরাং সম্রাট আকবরকে মুসলিম বলার কোনো সুযোগ নেই। উপরন্তু কোনো মুসলিম কোনো কিছুর প্রচলন করলেই তা পালনীয় হয়ে যায় না। বরং সেটাকে ইসলামের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখতে হয় তা কতটুকু গ্রহণীয় আর কতটুকু বর্জনীয়। (https://www.facebook.com/noyonchatterjee5/photos/a.296717957396541.1073741828.249163178818686/361898294211840/?type=3&theater)

তাছাড়া সম্রাট আকবর বাংলা সন চালু করেছিলেন বটে কিন্তু তিনি নববর্ষও উদযাপন করতেন এবং মঙ্গল-শোভাযাত্রাও করতেন তার প্রমাণ কী?

ঢাবির চারুকলা অনুষদে গোমাংস নিষিদ্ধ

আচ্ছা ধরে নিলাম, চারুকলা নিরেট বাঙ্গালিয়ানা সংস্কৃতি লালনের উদ্দেশ্যে মঙ্গলশোভাযাত্রার আয়োজন করে থাকে। এর সাথে হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতির কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। তবে চারুকলা অনুষদ ক্যান্টিনে গরুর মাংস নিষিদ্ধ কেন? চারুকলার সকল শিক্ষার্থীই কি হিন্দু? সংবাদের ভাষ্য মতে ১৪২৪ বঙ্গাব্দের পহেলা বৈশাখ শুক্রবার সাড়ে ৯টার দিকে মঙ্গলশোভাযাত্রা শেষে চারুকলা অনুষদের ক্যান্টিন থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে তেহারী পরিবেশন করা হয়। তেহারীতে গরুর মাংস ছিল জানতে পেরে শিক্ষার্থীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ক্যান্টিনে ভাঙচুর করে। বৈশাখ উদযাপনে শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ক সাগর হোসেন সোহাগ বলেন, 'চারুকলা অনুষদে গরুর মাংস রান্না সম্পূর্ণরূপে নিষেধ। কিন্তু ক্যান্টিন ম্যানেজার নাকি বিষয়টি জানেনেই না। এটা কেমন কথা। না জেনে তিনি ক্যান্টিন পরিচালনা করছেন? তিনি পরিকল্পিতভাবেই এ কাজ করেছেন। আমাদের দাবি, তাকে ক্যান্টিন থেকে বিতাড়িত করতে হবে এবং তদন্ত সাপেক্ষে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে।' চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. নিসার হোসেন বলেন, 'এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। চারুকলার ক্যান্টিনে কখনো গরুর মাংস পরিবেশন করা হয় না। কিন্তু তারা এটি কেন করলো, সেটি তদন্ত করে দেখতে হবে। এর মধ্যে মনে হচ্ছে একটা দুরভিসন্ধি আছে। সে কোনোদিন তেহারি করে না। আজ কেন করলো সেটিও খতিয়ে দেখার বিষয়।' তিনি আরো বলেন, 'আমরা অনেক আগেই শুনেছি যে, পয়লা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রাকে ভণ্ডুল করার একটা ষড়যন্ত্র চলছে। মনে হচ্ছে এ ঘটনাটি তারই একটি অংশ। বাংলা নববর্ষ- ১৪২৪ উদযাপন কমিটির সমন্বয়ক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, 'আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, এটাতে একটি দুষ্টচক্রের ষড়যন্ত্র আছে। এটি খতিয়ে দেখা উচিত। এটাকে হালকাভাবে দেখার সুযোগ নেই। খুব কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়ে ডিনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।' তিনি বলেন, 'বিষয়টি খুবই দুঃখজনক। তদন্তসাপেক্ষে দায়ীদের আইনের আওতায় আনা হবে। যাতে ভবিষ্যতে কেউ এমন কাজ করার সাহস না পায়।' (http://m.risingbd.com/cat/news/221992/url)

যারা এতদিন পহেলা বৈশাখী পূজাকে ধর্মনিরপেক্ষ উৎসব বলতো, মঙ্গলপূজাকে বাঙালীত্বের উৎসব বলতো তারাই আজকে গরুর মাংসের বিরোধিতা করছে। কেন? এরা পেঁচার মধ্যে মঙ্গল খুঁজে পায়, এরা সূর্যদেবের মূর্তির মধ্যে মঙ্গল দর্শন করে, কিন্তু গরুর মাংসের মধ্যেই তাদের অ্যালার্জি! কেন? গরুর মাংস কি বাঙালী সংস্কৃতি না? এতে কি প্রতীয়মান হয় না চারুকলা আয়োজিত পুরো অনুষ্ঠানটিই হিন্দুধর্মীয় সংস্কৃতি লালন করে? যে চারুকলা লক্ষ্মীপেঁচার মধ্যে এতদিন মঙ্গল খুঁজেছে, সে আজ গরুর মাংসে ষড়যন্ত্র খুঁজে পেয়েছে। (https://www.facebook.com/noyonchatterjee5/photos/a.296717957396541.1073741828.249163178818686/360831014318568/?type=3&theater)

স্কুল মাদরাসায় মঙ্গলশোভাযাত্রা পালন বাধ্যতামূলক?

গত বছর দেশের প্রতিটি স্কুল ও সরকার পরিচালিত মাদরাসাগুলোতে নোটিশ পাঠিয়েছে প্রশাসন। বলেছে, বাধ্যতামূলকভাবে মঙ্গলশোভাযাত্রা করতে হবে। এ দেশের সংবিধানে স্পষ্ট বলা আছে, কাউকে অন্য ধর্ম পালনে বাধ্য করা যাবে না। বিশেষত সংবিধানের মৌলিক অধিকার- 'ধর্মীয় স্বাধীনতা' অংশের ৪১ এর ২ ধারায় স্পষ্ট বলা আছে, 'কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না'। সংবিধানকে পাশ কাটিয়ে সরকার এখন মুসলিম শিশু-কিশোরদেরকে একটি বিশেষ ধর্মের ধর্মাচার পালনে বাধ্য করছে। শাসকই যদি সংবিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখায় তবে জনসাধারণ কি করবে?

মঙ্গলশোভাযাত্রায় চারুকলার বাণিজ্যিক রূপ

মঙ্গলশোভাযাত্রার নামে তাদের ব্যবসায়িক আয়টাও কম নয়। একটা মুখোশ নিয়ে শোভাযাত্রায় হাঁটতে হলে খরচ করতে হয় ১৫শ' থেকে ২০ হাজার টাকা। তাছাড়া ছোট আকারের মুখোশ রয়েছে যেগুলোর দাম ৬শ' থেকে ৮ হাজার টাকার মধ্যে। এছাড়া পাখির দাম ৮০০ টাকা, সরার দাম ৬০০ টাকা, ছবির দাম ২০০০ টাকা থেকে ১০০০০ টাকা। আর বড় আইটেমগুলোর মোটা দাম তো রয়েছেই। https://www.facebook.com/noyonchatterjee5/posts/525005274567807

শেষকথা

বর্ষবরণের ধারণা ইসলামী শরীয়তে নেই। বর্ষকে বরণ করার মত কোনো কিছুই মুসলমানের সংস্কৃতিতে নেই। এটা হলো, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি। এর সাথে যদি অবিধানিক অন্য কোনো অনুষঙ্গ যুক্ত হয় তাহলে সে ব্যাপারে ইসলাম কতোটা কঠোর হবে তা বলাই বাহুল্য। আর যদি সে অনুষঙ্গগুলো কুফর-শিরক আশ্রিত হয় তাহলে তো সমাধান খুবই সহজ। যারা বলেন, প্রচলিত বৈশাখী উৎসব নিছক দেশীয় কালচার, এর সাথে ইসলামকে টেনে আনার দরকার নেই তাদের ঈমানগত অবস্থান নির্ণয় করা খুবই জটিল। আল্লাহ আমাদেরকে সর্বপ্রকার অনাচার থেকে মুক্ত থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক : শিক্ষাসচিব, মা'হাদুল বুহূসিল ইসলামিয়া,
বছিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

(৮ পৃষ্ঠার পর; সাক্ষাৎকার)

এই হাদীস অনুযায়ী তো প্রচলিত মাদরাসাসমূহ পরিত্যাজ্য হওয়া উচিত। কারণ, এই পদ্ধতির মাদরাসা তো 'করনে আউওয়াল' তথা ইসলামের প্রথমযুগে ছিলো না! অনুরূপভাবে মাদরাসার দরসের সময়সূচি নির্ধারণ, ঘন্টা বাজানো ও জামা'আত নির্ধারণ এগুলোও তো সে যুগে ছিলো না? সুতরাং এগুলো সবই বিদ'আত ও নব উদ্ভাবিত বিষয় হল। কাজেই হাদীসের আলোকে এগুলোও তো পরিত্যাজ্য হবার কথা? তার প্রশ্নের লম্বা ফিরিস্তি শুনে হযরত ছোট্ট করে শুধু এতটুকু বললেন, এখানে احداث فی الدین থেকে বারণ করা হয়েছে; احداث للدین থেকে নয়।' এই দুটি কথায় তিনি তার সব প্রশ্নের সদুত্তর দিয়ে দিলেন। অর্থাৎ প্রচলিত মাদরাসা ও এ সংক্রান্ত 'ইহদাস' বা নব উদ্ভাবন মূলত দীনকে শক্তিশালী করণার্থে, দীনের সাহায্য করণার্থে; খোদাপ্রদত্ত দীনকে বিবর্তনের জন্য নয়। লক্ষ করে দেখো! কোনো মাদরাসায় সকালে দরস হয়, আবার কোথাও সন্ধ্যায়। এটা নয় যে, এই নিয়মতান্ত্রিকতাকে তারা দীন মনে করে করছেন যে, এভাবেই হতে হবে; এর ব্যতিক্রম হতে পারবে না। এভাবেই হযরত احداث فی الدین এবং احداث للدین এই দুটি শব্দের মাধ্যমে সকল প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিলেন।

[বি.দ্র. احداث للدین বলে তিনি যা বুঝিয়েছেন তা শরয়ী পরিভাষার ইহদাস বা নিষিদ্ধ নবউদ্ভাবিত বিষয় নয়; বরং তা ব্যবস্থাপনাগত একটি ব্যাপার মাত্র।]

এ সম্পর্কে আরেকটি ঘটনা মনে পড়ছে। হযরতম মাওলানা ইসমাঈল শহীদ রহ.-এর সময়ে কোন এক আরব হিন্দুস্তান আসলেন। সে যুগে হিন্দুস্তানে আরবদের যাতায়াত ছিলো না থাকার মতোই। কিভাবে যেনো তিনি এসে পড়লেন আর অমনি উৎসুক জনতা তার পেছনে 'আরব সাহেব, আরব সাহেব বলে' চিলের মতো ছুটতে লাগলো। সম্মান ও ভালোবাসা প্রদর্শনপূর্বক সবাই তার আতিথেয়তার জন্য উদ্গ্রীব হল। আরব সাহেবও ভালোবাসা পেয়ে মুগ্ধ হচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। ঘটনাক্রমে কোন এক মসজিদে– যেখানে জাহেলদের সমাগম ছিলো –সে মসজিদে তিনি নামায পড়লেন এবং তার মাযহাব অনুসারে রফয়ে ইয়াদাইনের উপর আমল করলেন। উপস্থিত মূর্খ লোকেরা মনে করেছে, আড়ালে লোকটি হয়তো বদদীন। নামাযটাও ঠিকমতো পড়তে জানে না। নামাযের পর তাকে নিয়ে কানাঘুষা শুরু হয়ে গেলো। এমনকি সেই আরব মেহমানকে শারীরিকভাবেও নির্যাতন করা হলো। মোটকথা নিরূপায় লোকটির সাথে সবাই যাচ্ছেতাই আচরণ এবং প্রহার করলো। এই সংবাদ হযরত মাওলানা ইসমাঈল শহীদ রহ. পর্যন্ত পৌছলে তিনি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন এবং বললেন, আরব থেকে আসা মেহমান, যাকে সম্মানপ্রদর্শন ছিলো আমাদের দায়িত্ব; অথচ তার সাথেই কিনা এমন অশোভন আচরণ!? এরপর তিনি আদেশ করলেন, আজ থেকে আমাদের সব মসজিদে নামাযে রফয়ে ইয়াদাইনের উপর আমল হবে। তাঁর হুকুম অনুযায়ী এখন তো মসজিদে মসজিদে রফয়ে ইয়াদাইন শুরু হয়ে গেলো! কিছুদিন এভাবে গেলো যে, কোথাও রফয়ে ইয়াদাইন হচ্ছে, কোথাও হচ্ছে না। এই এক মহাবিপত্তি দেখা দিলো সবখানে। বাস্তবিক অর্থেই রফয়ে ইয়াদাইন শুরু হয়ে গেলো। ওদিকে এটা নিয়ে মানুষে মানুষে লড়াই-বিবাদও থেমে নেই। মোটকথা, তুমুল ফেতনা দেখা দিলো সবখানে। এমতাবস্থায় কিছু লোক হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল আযীয সাহেব রহ.-এর কাছে গিয়ে বললেন, আপনার ভাতিজা তো হুলুস্থুল কাণ্ড বাঁধিয়ে দিলো! তিনি আদেশ করেছেন, এখন থেকে সব মসজিদে রফয়ে ইয়াদাইন করতে হবে। এখন তো মহা বিপদ হয়ে গেলো! চতুর্দিকে ফেতনা ছড়িয়ে পড়েছে! আপনি তাকে ডেকে বোঝান। শাহ সাহেব বললেন, ভাই! ইসমাঈলের ধী-শক্তি সম্পর্কে তোমরা সম্যক অবগত। আমি তাকে কোনভাবেই কুপোকাৎ করতে পারবো না। আমি তাকে একটা বোঝালে সে তার সিদ্ধান্তের পক্ষে বিশটা যুক্তি দেখিয়ে আমাকেই বরং পর্যুদস্ত করে ছাড়বে! এবার বলো, আমি তার কী ইসলাহ করবো!? সবচে' ভালো হয়, এই বংশে ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাই শাহ আব্দুল কাদের সাহেব রহ.-কে ইজ্জত করেন। অথচ তিনি ছিলেন সবার ছোটভাই। কিন্তু তাকওয়া-পরহেযগারির কারণে বড়ভাইও তাকে সম্মান করতেন। তিনি চল্লিশ বছর আকবর মসজিদে ই'তিকাফ করেছেন। এ সময় কুরআন ছাড়া তাঁর ভিন্ন কোন ব্যস্ততা ছিলো না। শাহ আব্দুল কাদের সাহেব রহ. এই পর্যায়ের বুযুর্গ ছিলেন। তো শাহ আব্দুল কাদের রহ.-এর কাছে গিয়ে লোকেরা বললো, আপনার ভাতিজা তো এই এই ফেতনা বাঁধিয়ে দিলো। তিনি বললেন, ডাকো ইসমাঈলকে! মাওলানা ইসমাঈল শহীদ রহ. হাজির হলেন। শাহ আব্দুল কাদের রহ. জিজ্ঞেস করলেন, মিয়া ইসমাঈল! তুমি নাকি জনসাধারণকে রফয়ে ইয়াদাইন করার হুকুম করেছো? তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিলেন, জ্বী হযরত! জিজ্ঞেস করলেন, কেন? বললেন, হযরত! এই সুন্নাত এখন এতোটাই মৃতপ্রায় যে, এর উপর আমল করার কারণে লোকেরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু করে দিয়েছে। আর হাদীস শরীফে এসেছে,

من احيا سنتی عند فساد امتی فله اجر شهيد

তাই আমি একটি মৃতপ্রায় সুন্নাত যিন্দা করেছি। এই সুন্নাত এতোটাই নিষ্প্রভ হয়ে গেছে যে, এর উপর আমল করার কারণে মানুষকে মার খেতে হচ্ছে। তাই আমি এই ভেবে হুকুম করেছি যে, এই মৃতপ্রায় সুন্নাতটির উপরও যেন আমল শুরু হয়ে যায়। শাহ আব্দুল কাদের রহ. বললেন, মিয়া ইসমাঈল! আমি তো মনে করেছিলাম, তুমি হাদীস কিছুটা বুঝে-শুনে পড়েছো! এখন দেখছি, তুমি 'হাদীসের বুঝ'-এর ধারেকাছেও যেতে পারোনি! ইহয়ায়ে সুন্নাত বা সুন্নাত যিন্দা করার যে মর্ম তুমি বুঝেছো, হাদীসে কী সেটা বোঝানো হয়েছে? ইহয়ায়ে সুন্নাত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেখানে সুন্নাত মিটে গিয়ে তদস্থলে বিদ'আত শুরু হয়েছে, এই হাদীস তো সেখানে সুন্নাত যিন্দা করার ব্যাপারে বলা হয়েছে। আর এখানে তো সুন্নতের বিপরীতে খোদ অপর আরেকটি সুন্নাত বিদ্যমান। অর্থাৎ রফয়ে ইয়াদাইন করা যদি সুন্নাত হয়, তবে না করাও তো সুন্নাত। এ জন্যই এক ইমাম এদিকে গেছেন, তো অন্যজন ওদিকে গেছেন। তাছাড়া এখানে ইহয়ায়ে সুন্নাত বা সুন্নাত যিন্দা করার জায়গা তুমি কোথায় পেলে?

ইহয়ায়ে সুন্নাত তো সেখানে করতে হয়, যেখানে সুন্নাত বিলুপ্ত হয়ে তদস্থলে বিদ'আত জারি হয়ে গিয়েছে। এখন বল, এ এলাকায় কোন্ সুন্নাতটি মিটে গিয়ে পরিবর্তে কোন বিদ'আতটি চালু হয়েছে? মাওলানা ইসমাঈল শহীদ রহ. বললেন, হযরত! আমার ভুল হয়ে গেছে! এরপর তিনি নিজেই সব মসজিদে গিয়ে গিয়ে ঘোষণা দিলেন– 'আমার ভুল হয়ে গেছে, সবাই আগের মতো রফয়ে ইয়াদাইন ছাড়াই নামায পড়বেন।'

তো বলছিলাম, আমাদের আকাবিরদের জন্য দীর্ঘ ভাষণ, লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দেয়ার প্রয়োজন হতো না। তাঁদের এক দু'টি বাক্য থেকেই সব সমস্যার সমাধান বেরিয়ে আসতো। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন ইস্তি'দাদ বা যোগ্যতা অত্যন্ত মজবুত হবে এবং যাবতীয় জ্ঞানের ভাণ্ডার হাতের মুঠোয় থাকবে। এখন তো মেহনত নেই বললেই চলে। ধী-শক্তিও অতোটা প্রখর নয়। উপস্থিত জ্ঞানের ভাণ্ডারও প্রায় শূন্য। কিতাবাদি দেখে কোনরকমে বয়ান করে দিয়েই শেষ! এটা তো শুধু নকল করে দেয়া। মোদ্দাকথা, ইস্তি'দাদ দিনদিন দুর্বল হতে চলেছে। এই দুর্বলতা নেসাবের কারণে নয়; বরং পাঠদান পদ্ধতি ও শিক্ষকদের ইলমী উৎকর্ষের উন্নতি না হবার কারণে। এখনকার অনেক শিক্ষকের অবস্থা হচ্ছে, পড়াতে হবে তাই পড়িয়ে দিচ্ছি। তারা এটাকে পেশা মনে করছেন। এটাই ইস্তি'দাদ কমযোর হবার কারণ। অপরদিকে দেশে গণতন্ত্র এসে শিক্ষার্থীদের অবস্থা এতোটাই বেহাল করে দিয়েছে যে, পূর্বে যা-ই যৎসামান্য ইলমের একাগ্রতা ছিলো তা-ও শেষ হয়ে গেছে। সবাই সারাক্ষণ রাজনীতি ও সমাজসেবায় অংশগ্রহণের ফিকিরে বিভোর। অথচ ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন, العلم لا يعطيك بعضه حتي تعطيه كلك অর্থাৎ তুমি ইলমকে তোমার পূর্ণটা না দিলে সে তোমাকে আংশিকও দেবে না। এখন তো আমরা আংশিকও দিচ্ছি না, তাহলে পুরোটা আশা করি কিভাবে? আর শিক্ষার্থীদের অবস্থা হল, তারা কখনো এদিকে ছুটে, কখনো ওদিকে। ব্যবসা-বাণিজ্যসহ তাদের আরো কতো কী ধান্ধা! এর মাঝে সামান্য ফুরসত পেলে একটু-আধটু ইলমের প্রতিও মনোনিবেশ করে! এমতাবস্থায় ইস্তি'দাদ মজবুত হবে কিভাবে?[১]

এজন্যই বলি, کچھ لوہار کھوٹا کچھ لوہا کھوٹا، একদিকে শিক্ষক সামনে বাড়তে চায় না, অপরদিকে শিক্ষার্থীরা মেহনত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। আর বেলাশেষে সবাই 'নেসাবের দুর্বলতা' বলে সমস্ত দায়ভার নেসাবের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। আমাদের উস্তায হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহীম সাহেব রহ. স্বল্পভাষী ছিলেন। কেউ একজন হযরতকে বলল, 'হযরত! নেসাবে কিছুটা পরিবর্তন আনা দরকার!' তিনি স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে 'হুঁ' বলে দীর্ঘটান দিয়ে বললেন, দেখো! তালীমের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় আবশ্যক– ১. শিক্ষক, ২. শিক্ষার্থী, ৩. পাঠ্যক্রম। শিক্ষকদের তো বিশাল জামা'আত আছে এবং হাতে ছুরিও আছে। কেউ বিরুদ্ধে বলবে তো গর্দান কেটে হাতে ধরিয়ে দেবে। আর এই যুগের শিক্ষার্থীরা তো ভাই, ভিমরুলের চাক! কেউ তাদের বিরক্ত করবে তো তার শেষ দেখে ছাড়বে! সবাই তাদের ভয় পায়। ব্যস, এখন শুধু রয়ে গেছে অসহায় নেসাব! প্রতিবাদের জন্য বেচারার না আছে হাত-পা, না আছে ভাষা! তাই সবাই এখন নিজেদের ব্যর্থতার যত্তোসব দায়ভার এর উপর চাপিয়ে বলে, নেসাবে এই সমস্যা! ওই সমস্যা!! নেসাব এমন হওয়া উচিত! অমন হওয়া উচিত!!

প্রশ্ন : হযরত! মাদরাসার ফাযেলদের (শিক্ষা সমাপনকারী) মাঝে এখন আর সেই আগ্রহ ও স্পৃহা পরিলক্ষিত হয় না, যেমনটা পূর্বেকার ফাযেলদের মাঝে ছিলো। বাতিলের প্রতিরোধ এবং নিজ থেকে অগ্রসর কাজ করার প্রবণতা তো এখন নেই বললেই চলে! এর কারণ কী?

উত্তর : প্রথম কথা হচ্ছে, হাদীস শরীফে এসেছে,

الناس كابل مأة لا تكاد تجد فيها راحلة؛

'মানুষ যেন শত উটের একটি পাল। কিন্তু বাহনযোগ্য হয় একটিই।' তো এই পঞ্চাশ হাজার শিক্ষার্থীদের মাঝে এটা অসম্ভব যে, সবাই অনুপযুক্ত। তবে একশজনের মধ্যে এক-দুজন যোগ্য ও উপযুক্ত হলে সেটা না হবার মতোই দেখায়।

এখন যারা শিক্ষা সমাপন করে বেরোচ্ছেন সবাই নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করছেন। হ্যাঁ, কাজ করার লোক অবশ্যই আছে এবং কাজও হচ্ছে। কাজের লোক যদি না-ই থাকে তাহলে দীনের কাজ চলছে কিভাবে? বাহাস, মুনাযারা, বাতিল প্রতিরোধ সবই তো হচ্ছে। আমাদের লোকেরাই তো করছেন। এদের মধ্যে যুবকরাও আছে। তবে সংখ্যা নেহাতই কম।

আসলে মূল সমস্যা হচ্ছে, বর্তমানে আর্থিক অবস্থা ভেঙে পড়েছে। ফলে ছাত্র যামানা থেকেই শিক্ষার্থীরা আর্থিক অনটনের দুশ্চিন্তার শিকার হচ্ছে। সবসময় তারা ফিকিরে থাকে যে, দ্রুত পড়াশোনা শেষ করে সংসারে মনোনিবেশ করতে হবে। বাবা বুড়ো হয়ে গেছেন। মা ইন্তিকাল করেছেন। অমুক হারিয়ে গেছেন। এখন দু-চার পয়সা কামাই করলেই না সবাই মিলে চারটা খেতে পারবে, ইত্যাদি। এই যখন অবস্থা, তাহলে উন্নতি কিভাবে করবে? বর্তমানে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই এ দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, কওমী মাদরাসায় যারা আসছেন, তাদের কম সংখ্যকই উঁচু চিন্তা-চেতনা লালন করেন। বেশিরভাগই সংকীর্ণ মনমানসিকতা এবং চেতনার দৈন্যতায় ভোগেন। তারা দেখছেন, এখানে তো বিনে পয়সায় রুটিও পাওয়া যাচ্ছে। এভাবে আট-নয় বছর নিশ্চিন্তে চলে যাবে। নেসাব বা পাঠ্যবইসমূহ তো তারা আত্মস্থ করে নেয়, কিন্তু এর বাইরে আর তাদের মেধা কাজ করে না। আর এটা হয় হীনমন্য এবং আত্মবিশ্বাসী না হবার কারণে।

ফারূকে আযম রাযি. একবার আরয করলেন, ইলমের অধঃপতন কখন হবে আমি কি তোমাদেরকে বলে দেবো? উপস্থিত লোকেরা বললেন, জ্বী, বলে দিন! তিনি বললেন, যখন নিম্নশ্রেণীর মানুষ এই ইলম শিখতে শুরু করবে। যারা নিজেরাই হীনমন্যতায় আক্রান্ত, চিন্তা-চেতনায় সংকীর্ণ।

১. এই যুগে তো মোবাইল, সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যস্ততা শিক্ষার্থীদের তো বটেই, শিক্ষকদেরও কাজ বিনষ্ট করে দিচ্ছে। কিতাবাদি মুতালা'আ আরোও কম হয়ে গেছে। এখন শুধু যশখ্যাতি আর ধনদৌলত উপার্জনই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে!

প্রশ্ন : হযরত! উঁচু চিন্তা-চেতনার অধিকারী এবং অভিজাত ব্যক্তিবর্গ তো তাদের সন্তানদের মাদরাসায় পাঠায় না। তাদেরকে এদিকে আনার পরিকল্পনা কী হতে পারে?

উত্তর : কথা হচ্ছে, জনসাধারণের মধ্যে এখন দুনিয়াদারির প্রভাব বেড়ে গেছে। আগের যুগে মানুষ আখেরাতকে প্রাধান্য দিতেন। এখনকার সময়ে একটু মেধাবী হলেই মানুষ সরকারি পদ-পদবী ও চাকরি-বাকরির প্রতি লালায়িত হয়। এজন্য তারা বেশিরভাগই ওদিকে ঝুঁকছেন এবং এদিকে নেহাতই কম আসছেন। তাদের মধ্য থেকে এদিকে কেবল তারাই আসেন যারা ওদিকে অযোগ্য বিবেচিত হন। তারা চিন্তা করেন, এখানে যখন হচ্ছে না, কী আর করা, চলো, দীনের কাজেই লেগে যাই!

আর আমাদের অবস্থা হল, মাদরাসা যেহেতু দীন শেখানোর কেন্দ্র, তাই যারাই আসেন না কেন, আমরা শেখানোর জন্য বিলকুল প্রস্তুত, চাই তার মেধা যেমনই হোক! কিন্তু আগের যামানায় চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হতো যে, এই ছাত্রের জন্য কোন বিষয়ে পড়াশোনা করা উপযোগী হবে। নিরীক্ষণ করে সেই বিষয়কে তারা প্রাধান্য দিতেন। ফলে ছাত্রটি নির্ধারিত বিষয়ে সফলতার উচ্চ শিখরে আরোহন করতো।

একবার আমি আফগানিস্তানে গিয়েছিলাম। সে দেশের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী সর্দার নাঈম সাহেব আমার কাছে অভিযোগ করে বললেন, হযরত! আমরা এই পদক্ষেপ নিয়েছি, ওই পদক্ষেপ নিয়েছি, কিন্তু কোনভাবেই সফল হতে পারছি না! আমাদের কোন ইচ্ছাই বাস্তবায়ন হচ্ছে না! আমি জিজ্ঞেস করলাম, জনাব! কী সেই ইচ্ছে?

তিনি বললেন, আমরা চাচ্ছি, কোন আলেমকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বানাবো, আবার কোন আলেমকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বানাবো। কিন্তু তারা তো এই কাজের জন্য মানানসই না। আমি বললাম, আপনার অভিযোগের সদুত্তর একটু পরে দিচ্ছি। তবে আমার মনে হচ্ছে, আপনার এই ইচ্ছে আদৌ পূর্ণ হবে না। আমি ইচ্ছে করেই একটু প্যাঁচালো জবাব দিলাম। নতুবা এর সরল জবাব তো এটাই ছিলো যে, ভাই! আজকাল রাজনীতি একটা স্বতন্ত্র বিষয়। কেউ শিখলে পারে, না শিখলে পারে না। সুতরাং কেউ মুহাদ্দিস হতে পারেন, ফকীহ হতে পারেন কিন্তু পলিটিক্স বা রাজনীতি বিষয়ে যথার্থ ধারণা না থাকলে এই ময়দানে টিকতে পারবেন না। কিন্তু এই জবাব আমি তাকে দেইনি। আমি বলেছি, আমার ধারণা, আপনার এই ইচ্ছে আদৌ আলোর মুখ দেখবেনা। তিনি শুধালেন, কেন? বললাম, তার কারণ হচ্ছে, আপনি আফগানিস্তান থেকে যে সব শিক্ষার্থী আমাদের কাছে পাঠান, কে জানে কোন জঙ্গল থেকে ধরে এনে পাঠিয়ে দেন! হীনমন্য, গ্রাম্য জনগোষ্ঠী। এদের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের জন্যই তো দশ বছর প্রয়োজন। তার পর দশ বছর প্রয়োজন পড়ানোর জন্য। পক্ষান্তরে এরা যদি মন্ত্রী পরিবারের বা শাহী খান্দানের সন্তান হতো, ওদেরকে দেখিয়ে দিতাম 'ইলম কেয়া চীজ হ্যাঁয়!'

এবার বলুন, আপনি জংলী আর পাহাড়িদেরকে জঙ্গল থেকে ধরে ধরে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন, তো ইলম ওদের উপর কী প্রভাব ফেলবে!? আমার কথায় মন্ত্রী মহোদয় মাথা নাড়ছিলেন আর বলছিলেন,

مولانا حق می فرمائید؛ حق می فرمائید؛ !!

(মাওলানা! আপনি ঠিকই বলছেন, সত্যই বলছেন)

এরপর আমি বললাম, উদাহরণ স্বরূপ বলি– আচ্ছা! আপনার দৃষ্টিতে মুফতী কিফায়াতুল্লাহ সাহেব কেমন মানুষ? বললেন, অনেক উঁচু মাপের ব্যক্তিত্ব। হিন্দুস্তানে তিনি অমুক অমুক কাজ করেছেন...। আমি বললাম, তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের ফাযেল; কোন ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট নন। তারপর বললাম, বলুন তো, মাওলানা হুসাইন আহমাদ সাহেব কেমন? আমার কথা শেষ করবার আগেই তিনি বলতে লাগলেন, বাহবা! সুবহানাল্লাহ! তিনি তো অনেক অনেক উঁচু মাকামের অধিকারী...। বললাম, তিনিও দারুল উলূমের সন্তান; কোন ইউনিভার্সিটির নন। এবার বললাম, আচ্ছা! মাওলানা শাব্বীর আহমাদ সাহেব, যিনি পাকিস্তান চলে গিয়েছেন, তার সম্পর্কে আপনার কী ধারণা? বললেন, তিনিও অনেক উঁচু মাপের মানুষ। আমি বললাম, হ্যাঁ, তিনিও কোন ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েশন করেননি। এভাবে আমি আরো দশ-বিশজনের নাম বলে বলে তাঁর স্বীকারোক্তি নেয়ার পর বললাম, তাঁরা সবাই পারিবারিকভাবে উঁচু চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন। তারপর ইলম তাঁদের সেই চিন্তাধারাকে আরো শানিত করেছে এবং তাদের মেধাকে আরো বিস্তৃত ও বিকশিত করেছে। বস্তুত ইলম মানুষের মধ্যে কোন জিনিস উদ্ভাবন করে না। বরং উদ্ভাবিত জিনিসকে উদ্ভাসিত করে দেয়। মন্ত্রী মহোদয় বললেন, নিঃসন্দেহে জনাব! এরপর তিনি বললেন, আজ আমি ওয়াদা করছি, শাহী খান্দান এবং মন্ত্রী পরিবার থেকে প্রতিবছর আমি এগারোজন করে শিক্ষার্থী আপনাদের কাছে পাঠাবো। আমি বললাম, এবার তবে আমরাও আপনাকে দেখাবো, এই ইলম তাদের কোন উচ্চতায় নিয়ে যায়! কিন্তু আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। সেটা হল, আমাদের ওখানে শাহী খান্দানের এই শিক্ষার্থীদের খেদমত কে করবে? তাদের তাহযীব-তামাদ্দুন ও সভ্যতা-সংস্কৃতি সব কিছুই তো আমাদের চেয়ে ভিন্ন। আমাদের ওখানে তো শুধু গরীব শিক্ষার্থীদের আশ্রয়স্থল। তাছাড়া এদের আদর-আপ্যায়নের জন্য তো কাড়িকাড়ি রুপিরও প্রয়োজন। কারণ, কেউ মন্ত্রীর সন্তান, কেউ বাদশাহর...। এই চিন্তা আমাকে পেয়ে বসলো। বিষয়টি তাঁকে জানালে তিনি বললেন, না, না! এ নিয়ে আপনি একদমই চিন্তা করবেন না। এসব দায়দায়িত্ব আমাদের সরকার বহন করবে। যা খরচ হবে পুরোটাই আফগান সরকার দেবে। এবার আমি মনে মনে বললাম, ব্যস! আমার আর কী চাই! আমি তো এটাই চেয়েছিলাম। মন্ত্রী মহোদয়কে বললাম, অত্যন্ত মুবারক খেয়াল আপনার। আমরা তাদেরকে তালীম দেয়ার জন্য প্রস্তুত। আর আমাদেরও আপনাদের কাছে একটি অনুরোধ থাকবে। সেটা হলো, আমরাও আমাদের এগারোজন শিক্ষার্থী আফগানিস্তানে পাঠাবো। আপনার এখানে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। আফগানিস্তানে 'নাজাত কলেজ' বিশুদ্ধ

জার্মানভাষার জন্য খ্যাত। ‘ইস্তিকলাল কলেজ’ বিশুদ্ধ ফ্রেন্সভাষার জন্য। ‘কালুল পে তিব’ বিশুদ্ধ তুর্কিভাষার জন্য। অনুরূপ ইংরেজির জন্যও আলাদা কলেজ আছে। এরপর আমি বললাম, আমরা আর্থিকভাবে সাবলম্বী হয়ে বহির্বিশ্বে দীনের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজও করতে চাই। কিন্তু আমরা বহির্বিশ্বের ভাষাজ্ঞানশূন্য। আপনার এখানে তো বিভিন্ন রকম কলেজ আছে। সুতরাং আপনি এগারোজন পাঠাবেন আর আমরাও এগারজন পাঠাবো। আমরা এদেরকে ইলমে দীন শিক্ষা দেবো, আর আপনি ওদেরকে বিদেশী ভাষা শেখাবেন। বললেন, আমরা অবশ্যই তাদের জন্য স্পেশাল সব ব্যবস্থাপনা করবো এবং ব্যয়ভারও আমরা বহন করবো। তাদের জন্য নেসাব বা সিলেবাসও সংক্ষিপ্ত করবো, যেন সময় বেশি না লাগে এবং ভাষাও দ্রুত শেখা হয়। যাই হোক, এভাবে আমাদের মাঝে চুক্তি সম্পন্ন হলো। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! ওদিকে যুদ্ধ বেঁধে গেলো আর আমাদের সব পরিকল্পনাও ধূলিস্মাৎ হয়ে গেলো।

তো কথা চলছিল, যোগ্য লোক তো তৈরি হচ্ছে, কিন্তু যোগ্যতার মাত্রা নিম্নগামী হয়ে যাচ্ছে। বলুন! এর কী সমাধান! বস্তুত চিন্তার দৈন্যতা গ্রাস করে নিলে এর কোন সমাধান নেই। মাদরাসায় বেশিরভাগ তারাই আসছেন যারা এই ব্যাধির (ফিকরি অধঃপতনের) শিকার। আর যারা উন্নত চিন্তা-চেতনাধারী তারা হাজারে এক দু’জন আসে। তবে যে আসে, সে মাথা উঁচু করেই ফিরে যায়! এ বিষয়টি হাদীসে পাকেও বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

خيار كم في الجاهلية خيار كم في الاسلام.

যে জাহেলিয়াতের যুগে উঁচু ছিলো সে ইসলামের যুগেও উঁচু থাকবে। যে ওখানে পিছিয়ে ছিলো, সে এখানেও পিছিয়ে থাকবে। তবে দীন সবার মধ্যেই এসে যাবে।

উঁচু চিন্তা-চেতনা মূলত খোদাপ্রদত্ত বিষয়। ঠিক একই কথা এখানেও। তবে কেউ নিজে চেষ্টা, মেহনত করে উঠে যেতে পারলে তা ভিন্ন কথা...।

এখন এই উঁচু চিন্তা-চেতনাধারীদের সন্তানদেরকে মাদরাসায় আনতে হলে নসীহত করে, ভয়ভীতি দেখিয়ে হবে না। আপনি লাখো নসীহত করেন যে, ভাই! তোমরা আসো, তারা আসবে না। কাজেই এর জন্য এমন কৌশল অবলম্বন করতে হবে যে, তারা নিজেরাই বাধ্য হয়ে ইলমে দীন শেখার জন্য ছুটে আসে। বাদশাহ আলমগীরও এমনই এক কৌশল অবলম্বন করেছিলেন।

বাদশাহ আলমগীরের যুগে উলামায়ে কেরাম সহায়-সম্বলহীন ছিলেন। তাদের হালপুরসি করারও কেউ ছিল না। লোকেরা দুনিয়ার দিকে, বড়বড় পদ-পদবীর প্রতি ঝুঁকে গিয়েছিল। ইলমে দীন শেখার তেমন কেউ ছিলো না। সরকারী পদ-পদবীর তালাশে সবাই বিভোর। রয়ে গেলেন বেচারা উলামায়ে কেরাম। আলমগীর যেহেতু নিজেই আলেম ছিলেন তাই বিষয়টি তিনি উপলব্ধি করলেন। তিনি না কোন শাহী ফরমান জারি করেছেন, না কোন নসীহতনামা লিখেছেন। একদিন হুকুম করলেন, আমি উযূ করবো, আর অমুক প্রদেশের গভর্নর আমাকে উযূ করাবেন। গভর্নর তো মহাখুশী, আজ বাদশাহকে উযূ করাবে। বাদশাহ তাকে এমন সুযোগ দেয়ার জন্যে সাতবার সালাম করে, অযুর পাত্র নিয়ে অগ্রসর হলো। আলমগীর জিজ্ঞেস করলেন, উযূর সুন্নত কয়টি? ওয়াজিব কয়টি? এখন বেচারা কোনদিন উযূ করলেই না বলতে পারবে! ব্যস, বোবার মতো দাঁড়িয়ে রইল। আলমগীর বললেন, আশ্চর্য ব্যাপার তো!

আপনি একজন রাজ্যশাসক। হাজারো মানুষের উপর রাজত্ব করছেন এবং তারা সবাই মুসলমান। অথচ আপনার এটাও জানা নেই যে উযূর ফরয কয়টি? ব্যস! তিনি এতটুকুই বলে ক্ষ্যান্ত দিলেন।

পরদিন আবার হুকুম দিলেন, অমুক রাজ্যের শাসক আজ আমাদের সাথে ইফতার করবেন। তিনি ইফতারে শরীক হলেন। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, রোযা ভঙ্গের কারণ কয়টি? কী কী কারণে রোযা মাকরূহ হয়? বেচারার তো কিছুই জানা নাই। বাদশাহ তাকেও শাসিয়ে দিলেন যে, বড় পরিতাপের বিষয়! আপনি মুসলমানদের রাজ্য শাসন করেন অথচ আপনার এগুলো জানা নেই!

এভাবে অন্যদিন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করলেন। ফলাফল এই দাঁড়ালো, এখন মৌলবীদের সবাই হন্যে হয়ে খুঁজতে শুরু করলো। কারণ, মাসআলা জানতে হবে, না হয় বাদশাহর সামনে অপদস্থ হতে হবে।

এখন তো মৌলবীরা সোনার হরিণ! চাইলেই তাদের পাওয়া যায় না। দুদিন আগের মূল্যহীন মৌলবীদের মূল্য এখন বেশ চড়া। আকাশচুম্বী তাদের কদর। তারা সহজেই রাজি হচ্ছেন না। কেউ বলছেন, মন্ত্রীমশাই! আমরা পাঁচশোর কম বেতনে যাবো না। কেউ বলছেন, হাজারের কমে হবে না। অসহায় মন্ত্রীরা বললেন, ভাই! পাঁচশো, হাজার নয়, দুইহাজার করে দেবো! তবু দয়া করে একটু আসুন! সবাই এখন মৌলবীদের পেছনে পঁইপঁই করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

বলছিলাম, ওয়াজ নসীহত দিয়ে কিছুই হতো না। তিনি কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, আর এতেই কেল্লাফতে।

প্রশ্ন : হযরত! যে সকল তালিবে ইলম দীনী মাদরাসা থেকে বেরোচ্ছেন, কর্মজীবনে প্রবেশ করে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছেন। সবাই যার যার মতো করে কাজ করছেন। কেউ দীনী কাজে আত্মনিয়োগ করছেন, আবার কেউ দুনিয়াবী কাজে। যারা দীনী কাজে ব্যাপৃত তারাও ছত্রভঙ্গ হয়ে করছেন। এমন কোন পন্থা অবলম্বন বা প্ল্যাটফর্ম গঠন করা যায় কিনা যে, মাদরাসা থেকে যে সব শিক্ষার্থী বেরোচ্ছেন তারা একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন? মাদরাসার তরফ থেকে মাঝে-মধ্যে তাদেরকে হিদায়াত দেয়া হবে। দেশের সংকটময় পরিস্থিতিতে দিকনির্দেশনা দেয়া হবে। তাদের প্রতিটি কাজ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে। এতে আশা করা যায়, শিক্ষার্থীরা তাদের ভবিষ্যত নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগবে না। তারা একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে চলে আসলে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতাও করা যাবে। মসজিদ, মাদরাসাসহ অন্যান্য খিদমতেও লাগানো যাবে। এই প্রস্তাবের ব্যাপারে হযরতের কী রায়?

উত্তর : জ্বী, ঠিক বলেছেন। এটা হওয়া উচিত। আমার মতে দুই প্রক্রিয়ায়

সবাইকে এক প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করা যেতে পারে। এক. জোর-জবরদস্তি করে। এটা তো সরকারের হাতে। দুই. বড় কেউ ইশারা করলে তাঁর ভালোবাসায় অনুপ্রাণিত হয়ে সবাই স্বতঃস্ফূর্ত একাট্টা হয়ে যাবে। এখন আমাদের উভয়টার অভাব। ইসলামী হুকুমত তো অস্তিত্বহীন। সুতরাং বলপ্রয়োগের কোন ব্যবস্থাই নেই। রইল শুধু দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বড় কারো ভালোবাসায় অনুপ্রাণিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত চলে আসা। এমন মানুষও এখন হাতেগোনা। আবার বড়দের মধ্যে কিছু আছেন মাদরাসা থেকে বিচ্ছিন্ন। ব্যক্তিত্বের কারণে সবাই তাদের মহব্বত করেন। আবার কিছু আছেন মাদরাসাসংশ্লিষ্ট, তবে তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। এজন্যই বলছিলাম, যতক্ষণ কোনরকম বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা না হবে, চাই সেটা সত্তাগত হোক বা সাদৃশ্যগত, ততক্ষণ সবাইকে এক প্ল্যাটফর্মে আনাটা সম্ভব হবে না।

আপনাদের ওখানে (পাকিস্তানে) বেফাকুল মাদারিসের অধীনে যে কাজ শুরু করা হয়েছিলো তার কী অবস্থা?

(আমি সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী বললাম,) হযরত! সেটা তো মাদরাসাগুলোর একটা সম্মিলিত প্ল্যাটফর্ম। আমার উদ্দেশ্য, সব মাদরাসা নিজেদের মতো করে ব্যক্তিগত একটি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলুক। অর্থাৎ প্রত্যেক মাদরাসা নিজেদের ফাযেলদেরকে সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে নিজেদের সাথে জুড়ে রাখবেন।

হযরত বললেন, হ্যাঁ, এটি তুলনামূলক সহজ। দেশের সব মাদরাসাসমূহকে একত্রিত করার তুলনায় এটি সহজ। তবে আমরা শুধু সচেতনতা তৈরি করা ছাড়া আর কিইবা করতে পারবো!? এর প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হোক। এর ফায়দা ও উপকার লিখিতভাবে তাদের সামনে রাখা হোক। আর এটা না হবার ফলে যে সব ক্ষতি হচ্ছে তা-ও হাতেকলমে দেখিয়ে দেয়া হোক। মোটকথা, তাদেরকে বুঝিতে দিতে হবে যে, আপনি তাদেরই কল্যাণার্থে একথা বলছেন যে, তোমরা যদি এভাবে নিজ নিজ ফাযেলদেরকে একসঙ্গে জুড়েমিলে রাখো তবে এর সুফল তোমরাই লাভ পাবে এবং তোমাদেরই মাথা উঁচু হবে, তোমাদেরই শক্তি বৃদ্ধি পাবে...। আপনার এই প্রস্তাবটি চমৎকার। এ ব্যাপারে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হোক। আর আমাদের দায়িত্বশীলদেরও সুমতি হোক...।

তবে আজকাল একটি অদ্ভুত প্রথা চালু হয়েছে যে, যে কোন বিষয়ে প্রথমেই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, এটা ভুল পন্থা। সঠিক নিয়ম হল, প্রথমে বিশেষ ব্যক্তিবর্গ, যাদের হাতে সাধারণের বাগডোর, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। এরপর দেখবেন, সাধারণরা আপনাআপনিই চলে আসবে। সেজন্য প্রথমে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের একত্রিত করে এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করা হোক।

প্রশ্ন : হযরত! এতক্ষণ মাদরাসা বিষয়ক প্রশ্নোত্তর চলছিলো। এখন সাধারণ মুসলমানদের সম্পর্কীয় এক-দুটি প্রশ্ন করতে চাচ্ছি। একটি হচ্ছে, পাকিস্তান সংসদে কাদিয়ানী প্রসঙ্গে যে বিল পাস হয়েছে সে ব্যাপারে আপনার মূল্যায়ন কী? এবং আপনি এটাকে কিভাবে ব্যখ্যা করেন?

উত্তর : আমরা এ ব্যাপারে বিবৃতি দিয়েছি। সেখানে পাকিস্তানের উলামা ও সরকারের প্রতি মোবারকবাদ জানানো হয়েছে। তাদের মহতী উদ্যোগের প্রসংসাও করা হয়েছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, এটি অত্যন্ত সাহসী উদ্যোগ ছিলো, যেটি পাকিস্তান সরকার বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছে। মূলত এটি আমাদেরই আকাবিরদের লালিত স্বপ্ন ছিলো। পাকিস্তান সরকার সেই স্বপ্নের ব্যখ্যা দিয়েছেন মাত্র। এই জয্বা দিলে ধারণ করতেন হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ., মাওলানা হাবীবুর রহিমান রহ., মাওলানা মুরতাযা হাসান রহ.। তারা চাইতেন, যে কোন উপায়েই এই জটিলতা কেটে যাক। কাদিয়ানীরা নিজেদেরকে মুসলমান নাম দিয়ে কাজ করছে। এটি চরম ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা বৈ কিছু নয়। কিন্তু তখন ইংরেজদের রাজত্ব ছিলো। কে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা দেবে? আল্লাহ তা'আলা এখন সেই স্বপ্ন পূরণ করেছেন। ওদিকে মধ্যপ্রাচ্যের ১৩২টি দেশেও কাদিয়ানীদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কাফের ঘোষণা করে বলা হয়েছে যে, তারা আমাদের দেশে প্রবেশও করতে পারবে না। এখন পাকিস্তানও এই সিদ্ধান্তের উপর সিলমোহর এঁটে দিয়েছে। এটি একটি আন্তর্জাতিক ইস্যু। মোটকথা, যে জটিলতা ছিলো তা কেটে গেছে। এখন আর কাদিয়ানীরা ইসলামের নামে কাজ করতে পারবে না। আমি পাকিস্তান সংসদের বিলের পক্ষে বিবৃতি দেয়ার পর থেকে কলকাতাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চিঠিপত্র আসতে শুরু করলো। সবাই বলছেন, এখন তো আমাদের কবরস্থানে তাদেরকে দাফন করা যাবে না। কিন্তু কবরস্থানের মালিকানা সরকারের হাতে। তাদেরকে বাঁধা দেয়ার সাধ্যও আমাদের নেই। এ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের মধ্যে এই জয্বা উথলে উঠলো যে, আমরা সরকারের সাথে মুকাবেলা করবো, সরকারের কাছে আমাদের দাবী উত্থাপন করবো এবং ফতওয়া দেখিয়ে বলবো, কবরস্থান ভাগ করে দাও, কাদিয়ানীদেরকে আমরা নিজেদের সাথে দাফন করতে দিবো না।

এছাড়াও আরো অনেক মাসআলা সামনে এসেছে। যেমন, পূর্বে কাদিয়ানীরা মুসলমানদের মসজিদে আসতো ইত্যাদি...। ফলাফল এই দাঁড়ালো, কয়েকশো কাদিয়ানী তওবা করে ফিরে এসেছে।

আমাকে ওখানকার লোকেরা লিখেছেন, আমরা একটি সোসাইটি গঠন করতে চাই। এর মাধ্যমে যারা ইসলামের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং এদিকে আসতে চাচ্ছে, সে সব কাদিয়ানীদের সন্দেহ-সংশয় নিরসন করা হবে...। আমি বললাম, সোসাইটি অবশ্যই গঠন করো তবে সংঘবদ্ধ হয়ে অথবা সেমিনার করে সংশয় নিরসনের কোন উদ্যোগ নিয়ো না। কাদিয়ানীরাও চাচ্ছে, তোমরা এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করো। কারণ, সেমিনারের ব্যবস্থা করে সংশয়-সন্দেহ উত্থাপন করা হলে তাদের জন্যও বহস, মুনাযারা বা একটি ভিন্নমত উত্থাপনের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। এতে তারা পা রাখার সুযোগ পেয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ! ব্যক্তিগতভাবে করো, সমস্যা নেই। কিন্তু কিছুতেই সংঘবদ্ধ হয়ে নয়। আমার এই পরামর্শ তারা কবুল করেছেন।

যাই হোক! পাকিস্তান সংসদে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার বিলটি পাস হওয়ায় এর প্রভাব হিন্দুস্তানেও পড়েছে। (স্থান : মদীনা মুনাওয়ারা, ১৯৭৪ ঈসায়ী)

অনুবাদ : মুহাম্মদ উমর ফারূক ইবরাহীমী
শিক্ষার্থী : ইফতা দ্বিতীয় বর্ষ, দারুল উলূম করাচী।

জরুরী মাসাইল

ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাত একটি বৈধ ও মুস্তাহাব আমল

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

প্রশ্ন ১ : ফরয নামাযের পর মুসল্লীদের নিয়ে সম্মিলিত মুনাজাত করা জায়েয না বিদআত?

প্রশ্ন ২ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাত করেছেন মর্মে হাদীস শরীফে কোন প্রমাণ বিদ্যমান আছে?

প্রশ্ন ৩ : মুনাজাত সম্মিলিত করা উত্তম, সম্মিলিত মুনাজাত আল্লাহর কাছে বেশি কবুল হয় এ কথার দলীল কী?

উল্লিখিত মাসআলাগুলোর দলীলসমূহ বাংলা তরজমাসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

নিবেদক
হাফেয মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
পিলখানা, ঢাকা

প্রথম প্রশ্নের উত্তর

ফরয নামাযের জামা'আতের পর সম্মিলিত যে মুনাজাত প্রচলিত আছে, তা জায়েয ও মুস্তাহাব আমল; বিদআত নয়। করলে ভালো, না করলে গুনাহ হবে না। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন মুনাজাতের কারণে মাসবূক মুসল্লীদের নামাযে বিঘ্নতা সৃষ্টি না হয়। উপরন্তু মুসল্লীদেরকে মাসআলাটি ভালোভাবে বুঝিয়ে বলবে, যাতে কেউ এটাকে ওয়াজিব বা জরুরী মনে না করে।

দলীল :

عن أبي أمامة قال: قيل يا رسول الله! أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات. هذا حديث حسن.

[أخرجه الامام الترمذي في سننه. رقم الحديث (٣٤٩٩) أبواب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم]

তরজমা : হযরত আবু উমামা রা. বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন দু'আ কবূল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী? ইরশাদ হলো, শেষ রাত্রে (তাহাজ্জুদের পরে) এবং ফরয নামাযসমূহের পরে।

(তিরমিযী শরীফ, হা.নং ৩৪৯৯, দু'আ অধ্যায়) ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান তথা ২য় স্তরের সহীহ হাদীস বলেছেন। উল্লেখ্য, এ হাদীসের উপর যখন সব মুসল্লী একই সময়ে আমল করবে, তো সেটা সম্মিলিত মুনাজাতই হবে। এই হাদীস ছাড়াও সম্মিলিত মুনাজাতের পক্ষে আরও স্পষ্ট হাদীস আছে, যার বর্ণনা ২নং প্রশ্নের উত্তরে আসছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয নামাযের পর হাত তুলে মুনাজাত করেছেন তার দলীল হল–

عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ، قال: رأيت عبدالله بن الزبير ورأى رجلا رافعا يديه يدعو قبل أن يفرغ من صلاته، فلما فرغ منها قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته.

[أخرجه الامام الطبراني في معجمه الكبير، رقم الحديث (١٤٩٠٧)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٩/١٠) رقم الحديث (١٧٣٤٥) وقال: رواه الطبراني، وترجم له فقال: محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن عبد الله بن الزبير، ورجاله ثقات]

তরজমা: হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া রহ. বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-কে দেখেছি, তিনি একব্যক্তিকে সালাম ফিরানোর পূর্বে হাত তুলে মুনাজাত করতে দেখে তার নামায শেষ হওয়ার পর তাকে ডেকে বললেন, 'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল নামায শেষ করার পরই দুই হাত উত্তোলন করে মুনাজাত করতেন; আগে নয়।'

(আল মু'জামুল কাবীর, হা.নং ১৪৯০৭, হাদিসটি সহীহ; মাজমাউয্-যাওয়ায়েদ হা.নং ১৭৩৪৫, হাদীস শাস্ত্রবিদগণ বলেন, হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। হাদীসটি সহীহ।)

عن الفضل بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتخشع، وتضرع، وتمسكن، وتقنع يديك، يقول: ترفعهما إلى ربك، مستقبلا ببطونهما وجهك، وتقول: يارب يارب، ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا.

[أخرجه الامام الترمذي في سننه رقم الحديث، (٣٨٥) (تحقيقه بشار) باب ماجاء في التخشع في الصلاة. قال الشيخ عبد الفتاح ابوغدة: والتحقيق أن هذا الحديث حسن صالح للعمل، وقال ايضا وصنيع الطحاوي في شرح مشكل الاثار (٢٤/٢-٢٦) واضح أن الحديث صحيح عنده]

অনুবাদ: হযরত ফযল ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নামায দুই দুই রাক'আত; প্রত্যেক দুই রাক'আতে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করতে হয়। ভয়-ভক্তি ও কাতরতার সহিত বিনীত হয়ে নামায আদায় করতে হয়। আর নামায শেষে দুই হাত এভাবে তুলবে যে, উভয় হাতের তালু স্বীয় মুখমণ্ডলের দিকে করে রাখবে। অতঃপর বলবে- হে প্রভু! হে প্রভু! যে ব্যক্তি এরূপ করবে না, সে এমন এমন অর্থাৎ তার নামায অসম্পূর্ণ। (তিরমিযী শরীফ, হা.নং ৩৮৫, হাদীস শাস্ত্রবিদগণ হাদীসটিকে হাসান তথা ২য় স্তরের সহীহ হাদীস বলেছেন।)

উল্লেখ্য, এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, উপরের হাদীসগুলোতে ফরয নামাযের পর দুআ কবুল হওয়া এবং হাত তুলে দু'আ করার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। তবে সম্মিলিত দু'আ যেহেতু কবুল হওয়ার প্রতিশ্রুতি আছে (যেমনটি সামনের হাদীসে আসছে) তাই ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাতও একটি উত্তম ও বৈধ পদ্ধতি হিসেবে সাব্যস্ত হয়। আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে কোন কাজের মৌখিকভাবে নির্দেশ বা উৎসাহ দেওয়ার পর তিনি নিজে করেছেন কিনা এ প্রশ্ন ঠিক নয়। কারণ ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকায় তিনি অনেক আমল সাহাবায়ে কেরামকে করতে বলেছেন, তা সত্ত্বেও নিজে করেননি। যেমন, তাহিয়্যাতুল মাসজিদের নামায, আযান দেয়া, ইশরাকের নামায পড়া ইত্যাদি।

(ফয়যুল বারী, শরহে সহীহ বুখারী; ২/১৬৭,৪৩১ ও ৪/৪১৭)

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর

সম্মিলিত মুনাজাত যে ভাল এবং তা আল্লাহর দরবারে বেশি কবুল হয়, এটি বহু শরয়ী দলীল দ্বারা প্রমাণিত। যেমন :

عن حبيب بن مسلمة الفهري، وكان مجاب الدعوة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم، ويؤمن البعض، إلا أجابهم الله.

[أخرجه الامام الطبراني في معجمه الكبير. رقم الحديث: (٣٥٣٦) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ١٧٠) رقم الحديث (١٧٣٤٧) باب التأمين على الدعاء. ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة، وهو حسن الحديث]

অনুবাদঃ হযরত হাবীব ইবনে মাসলামা আলফাহরী বর্ণনা করেন– যিনি ছিলেন মুস্তাযাবুদ্দাওয়াহ– আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যদি কিছু সংখ্যক লোক একত্রিত হয়ে এভাবে দু'আ করে যে, তাদের একজন দু'আ করতে থাকে, আর অন্যেরা আমীন, আমীন বলতে থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'আ অবশ্যই কবুল করে থাকেন।

(আল মু'জামুল কাবীর, হা.নং ৩৫৩৬, মাজমাউয্-যাওয়ায়েদ, হা. নং ১৭৩৪৭, হাদীস শাস্ত্রবিদগণ বলেন, হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। হাদীসটি সহীহ।)

عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رفع قوم أكفهم إلى الله عز وجل يسألونه شيئا، إلا كان حقا على الله أن يضع في أيديهم الذي سألوا.

[اخرجه الإمام الطبراني في معجمه الكبير. رقم الحديث (٦١٤٢)]

অনুবাদঃ হযরত সালমান রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন জামা'আত কিছু প্রার্থনা করার জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাত তুললে আল্লাহ তা'আলার উপর ওয়াজিব হয়ে যায় তাদের প্রার্থিত বস্তু তাদের হাতে তুলে দেয়া। (আল মু'জামুল কাবীর, হা.নং ৬১৪২)

আরো দেখুন–

(٣) عن ابن مسعود كما تقدم، كما ذكرنا له في صحيح البخاري وغيره في وضع الملا من قريش على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة سلا تلك الجزور، واستضحاكهم من ذلك، حتى أن بعضهم يميل على بعض من شدة الضحك، ولم يزل على ظهره حتى جاءت ابنته فاطمة عليها السلام فطرحته عن ظهره، ثم أقبلت عليهم تسبهم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته رفع يديه فقال: اللهم عليك بالملا من قريش، ثم سمى فقال: اللهم عليك بأبي جهل وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد، قال عبد الله بن مسعود: فوالذي بعثه بالحق لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. (البداية والنهاية – ٦ / ٢٩٤)

(٤) وبعث الصديق رضي الله عنه كما قدمنا إليهم العلاء بن الحضرمي فلما دنا من البحرين جاء إليه ثمامة بن أثال في محفل كبير وجاء كل أمراء تلك النواحي فانضافوا إلى جيش العلاء بن الحضرمي فأكرمهم العلاء وترحب بهم وأحسن إليهم وقد كان العلاء من سادات الصحابة العلماء العباد مجابي الدعوة اتفق له في هذه الغزوة أنه نزل منزلا فلم يستقر الناس على الأرض حتى نفرت الأبل بما عليها من زاد الجيش وخيامهم وشرابهم وبقوا على الأرض ليس معهم شيء سوى ثيابهم وذلك ليلا ولم يقدروا منها على بعير واحد فركب الناس من الهم والغم ما لا يحد ولا يوصف وجعل بعضهم يوصي إلى بعض فنادى منادي العلاء فاجتمع الناس إليه فقال أيها الناس ألستم المسلمين ألستم في سبيل الله ألستم أنصار الله قالوا بلى قال فأبشروا فوالله لا يخذل الله من كان في مثل حالكم ونودي بصلاة الصبح حين طلع الفجر فصلى بالناس فلما قضى الصلاة جثا على ركبتيه وجثا الناس ونصب في الدعاء ورفع يديه وفعل الناس مثله حتى طلعت الشمس وجعل الناس ينظرون إلى سراب الشمس يلمع مرة بعد أخرى وهو يجتهد في الدعاء فلما بلغ الثالثة إذا قد خلق الله إلى جانبهم غديرا عظيما من الماء القراح فمشى ومشى الناس إليه فشربوا واغتسلوا فما تعالى النهار حتى أقبلت الابل من كل فج بما عليها لم يفقد الناس من أمتعتهم سلكا فسقوا الابل عللا بعد نهل فكان هذا مما عاين الناس من آيات الله بهذه السرية ثم لما اقترب من جيوش المرتدة وقد حشدوا وجمعوا خلقا عظيما نزل ونزلوا وباتوا متجاورين في المنازل فبينما المسلمون في الليل إذ سمع العلاء أصواتا عالية في جيش المرتدين فقال من رجل يكشف لنا خبر هؤلاء فقام عبد الله ابن حذف فدخل فيهم فوجدهم سكارى لا يعقلون من الشراب فرجع إليه فأخبره فركب العلاء من فوره والجيش معه فكبسوا أولئك فقتلوهم قتلا عظيما وقل من هرب منهم واستولى على جميع أموالهم وحواصلهم وأثقالهم فكانت غنيمة عظيمة جسيمة. (البداية والنهاية – ٦ / ٣٢٨)

(٥) قلت القول الراجح عندي أن رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة جائز لو فعله أحد لا بأس عليه إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم. (تحفة الأحوذي لمحمد المباركفوري – ٤ / ٢٤٩)

(٦) اخرج الطبري من رواية جعفر بن محمد الصادق قال الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة كفضل المكتوبة على النافلة. (فتح الباري لابن حجر – ٥ / ٢٢٥)

দ্বি-মাসিক রাবেতায় লেখা পাঠানোর ঠিকানা

রাবেতা কার্যালয়

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, সাতমসজিদ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

ই-মেইল :

rabetaar@gmail.com

মোবাইল

০১৮২৬৬২১৬৬৯, ০১৯২৭৩২৪৬৪৭

০১৯১২০৭৪৪৯৫

গ্রন্থ পরিচিতি

মুফতী মাহমূদ আশরাফ উসমানী দা.বা. ও মাওলানা আব্দুল মালেক দা.বা. কৃত

তাসাওউফ : তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ

মাওলানা আব্দুর রায্যাক যশোরী

সমাজে তাসাওউফ সম্পর্কে বহু ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি বিদ্যমান। এগুলোর সংশোধন হওয়া খুবই জরুরী। কারও কারও ধারণা, তাসাওউফের বিধি-বিধান ও শিক্ষা-দীক্ষা কুরআন-হাদীসের পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দার্শনিক ও যোগীদের ধ্যান-ধারণা ও সাধনা দ্বারা প্রভাবিত। এ ভুল ধারণার কারণে অনেকে একে বিদ'আত ও গোমরাহী আখ্যা দিয়ে থাকেন। এই ভ্রান্তির মূল কারণ হল, হকপন্থীগণ যে তাসাওউফের কথা বলে থাকেন, সে তাসাওউফের হাকীকত ও বাস্তবতা সম্পর্কে তারা বিলকুল বে-খবর! তাছাড়া মূলতত্ত্ব ও অর্থের প্রতি নয়, বরং বাহ্যিক শব্দাবলীর প্রতি দৃষ্টি রেখেই তারা এ জাতীয় লঘু মন্তব্য করে থাকেন। তারা যখন তাসাওউফের ভিত্তি কুরআন-হাদীসে দেখতে চান, তখন 'তাসাওউফ' বা 'পীর-মুরীদী' জাতীয় শব্দ অনুসন্ধান করেন। বলবাহুল্য, কুরআন-হাদীসে তাসাওউফ বা পীর-মুরীদী শব্দ বিদ্যমান নেই, বরং সেখানে তাসাওউফকে 'তাযকিয়া' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। ব্যস, কুরআন-হাদীসে 'তাসাওউফ' শব্দ না পেয়ে তারা মূল তাসাওউফকে বিদ'আত ও গোমরাহীর সিল মেরে দেন। অথচ একথা সুস্পষ্ট যে, এগুলো নিছক পারিভাষিক শব্দ। এগুলোর মূলতত্ত্ব ও সারবত্তা যদি কুরআন-হাদীসে বিদ্যমান থাকে, তাহলে শুধু এসব শব্দ কুরআন-হাদীসে না থাকার কারণে কোন অসুবিধা নেই।

কারও কারও তাসাওউফের প্রতি বিতৃষ্ণার এটিও একটি কারণ যে, তাসাওউফ দাবীদারদের এমন একটি দল অতিবাহিত হয়েছে এবং এখনও বিদ্যমান রয়েছে, যারা বিভিন্ন রসম-রেওয়াজ, বিদ'আত-কুসংস্কার, বাতিল আকীদা-বিশ্বাস ও শরীয়তবিরোধী কার্যকলাপকে তাসাওউফ নাম দিয়েছে। অথচ প্রকৃত তাসাওউফ বা হক্কানী পীর-মুরীদীর সঙ্গে এগুলোর দূরতম কোন সম্পর্কও নেই। কিন্তু তাই বলে তো একটি শাশ্বত সত্য তাসাওউফ বা পীর-মুরীদীকে বদদীন লোকদের বাড়াবাড়ির কারণে অস্বীকার করা যায় না! হ্যাঁ, বাড়াবাড়ির প্রতিবাদ ও খণ্ডন অবশ্যই করতে হবে। বলুন না, দীন-দুনিয়ার কোন বিষয়টি আছে যা নিয়ে প্রতারণা, মিথ্যা ও জালিয়াতির আশ্রয় নেয়া হয়নি। কেউ নবুওয়াত নিয়ে প্রতারণা করত মিথ্যা নবুওয়াতের দাবী করেছে এবং কিছু হতভাগা তা মেনেও নিয়েছে। অনুরূপ যিন্দীক-মুলহিদরা জাল হাদীস বানিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে চালিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করেছে। আবার কেউ ভ্রান্ত আইন তৈরী করে তাকে শরীয়তের অংশ বানাবার অপচেষ্টা চালিয়েছে। আর কেউ কেউ তো মনগড়া উপাস্য পর্যন্ত বানিয়ে নিয়েছে। এসব প্রতারণা, মিথ্যা ও জালিয়াতির কারণে কি নবুওয়াত, হাদীস ও শরীয়া আইনের মূলতত্ত্ব ও বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায়? অবশ্যই নয়। বরং সত্য ও সঠিক বিষয়টি গ্রহণ করে ভেজাল ও ভ্রান্তিটুকু পরিত্যাগ করতে হয়।

তাসাওউফের বিষয়টিও এভাবে বোঝা উচিত। অর্থাৎ বাতিল তাসাওউফ বা ভ্রান্ত পীর-মুরীদী সর্বাবস্থায় বর্জনীয় এবং বিশুদ্ধ তাসাওউফ ও শুদ্ধ পীর-মুরীদী সর্বাবস্থায় গ্রহণীয়।

মনে রাখতে হবে, বিশুদ্ধ তাসাওউফের মূলতত্ত্ব ও কর্মপদ্ধতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তা সত্ত্বেও কেউ যদি তাসাওউফকেই অস্বীকার করে বসে তাহলে এটা তার মূর্খতা ও ভ্রান্তি বৈ কিছুই নয়।

প্রশ্ন হল, বিশুদ্ধ তাসাওউফের মূলতত্ত্ব ও কর্মপদ্ধতি কী? এ প্রশ্নের জবাব দিতে এবং ধান থেকে চিটা পৃথক করতেই রচিত হয়েছে 'তাসাওউফ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ' নামক মূল্যবান এক প্রামাণ্য গ্রন্থ। নিম্নে গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করা হচ্ছে।

গ্রন্থ ও গ্রন্থাকার

'তাসাওউফ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ' মূলত দু'টি উর্দু পুস্তিকার অনুবাদ-গ্রন্থের সমন্বিত নাম। এর প্রথমটি হল, উর্দু ভাষায় রচিত *তাসাওউফ কী হাকীকত*– (তাসাওউফের মূলতত্ত্ব)। লিখেছেন, জামি'আ দারুল উলূম করাচির সুযোগ্য মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা মুফতী মাহমুদ আশরাফ উসমানী দা.বা.। এটি নজরে সানী করেছেন শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুহাম্মদ তাকী উসমানী দা.বা.। আর দ্বিতীয়টিও উর্দু ভাষায় রচিত *তাসাওউফ : এক ইলমী জায়েযা*– (তাসাওউফ : তত্ত্ব ও পর্যালোচনা)। লিখেছেন, বাংলাদেশের অন্যতম হাদীস বিশারদ, গবেষক মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব দা.বা.। অনুবাদ করেছেন, মারকাযুদ্দাওয়া আল-ইসলামিয়ার উলূমুল হাদীস বিভাগের সহযোগী উস্তাদ; বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক হযরত মাওলানা মুতীউর রহমান সাহেব দা.বা.।

৩০৪ পৃষ্ঠার মূল্যবান এ গ্রন্থটি ১৪২১ হিজরীর শাবান মাসে 'মাকতাবাতুল আশরাফ' থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। ব্যাপক চাহিদার কারণে এ পর্যন্ত এটি বহুবার পুনঃমুদ্রিত হয়েছে।

বিষয়-বিন্যাস ও বৈশিষ্ট্যাবলী

প্রথম পুস্তিকাটি মূলত জামি'আ দারুল উলূম করাচীর দারুল ইফতায় প্রেরিত কয়েকটি প্রশ্নের জবাব। শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুহাম্মদ তাকী উসমানী দা.বা. জবাবগুলো আগ্রহের সাথে দেখেছেন এবং খুশি হয়ে দু'আ করেছেন। হযরতের নির্দেশক্রমে এর কিছু অংশ মাসিক আল-বালাগ-এ প্রকাশিত হয় এবং পাঠক মহলে সমাদৃত হয়।

প্রশ্নগুলো এই–

১. (ক) শরীয়তে তাসাওউফের বিভিন্ন সিলসিলার মান কি? (খ) তাসাওউফের সিলসিলা মোট কয়টি? (গ) এসব সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা কারা এবং কখন থেকে এগুলো শুরু হয়?

২. এসব সিলসিলার যে সকল সুনির্দিষ্ট যিকির তাঁদের নির্ধারিত পন্থায় করানো হয় তা সুন্নাহভিত্তিক, নাকি বিদ'আত?

৩. আত্মশুদ্ধির কোন পদ্ধতিটি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সুপ্রমাণিত? কালের পরিবর্তনের কারণে কি আত্মশুদ্ধির পদ্ধতিতেও পরিবর্তন সাধন জরুরী?

৪. শরীয়তে বাইআত গ্রহণ করার পদ্ধতি কী? উপস্থিত না হয়েও কি বাইয়াত হওয়া যায়?

৫. (ক) কোন কোন সিলসিলায় শ্বাসের মাধ্যমে যিকির করানো হয়ে থাকে, (খ) সে সব পীরগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য মৃত বুযুর্গদের সাথে সাক্ষাত করানোর দাবী

করে থাকেন– এ পদ্ধতিটি কেমন? এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাই।

৬. আমার কিছু বন্ধু-বান্ধবের ধারণা যে, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে ইসলামিক আর অনৈসলামিক সিলসিলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এটা শুধু তাওয়াজ্জুহ এবং মনের একাগ্রতার গুণ মাত্র। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে যে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

আলহামদুলিল্লাহ! মুহতারাম লেখক এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর জবাব লেখার পূর্বে একটি চমৎকার ও মূল্যবান ভূমিকা পেশ করেছেন। আর জবাবগুলো অত্যন্ত সাবলীলভাবে কুরআন-হাদীস ও যুক্তির আলোকে এত সুন্দর ও সুদৃঢ়ভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, সর্বস্তরের পাঠক তা অনায়াসে বুঝতে সক্ষম।

এছাড়াও পুস্তিকার শেষে যুক্ত করা হয়েছে এ বিষয়ে হযরত হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর মূল্যবান কিছু নসীহত।

প্রথম পুস্তকাটি ৪৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়েছে। এরপর থেকে ৩০৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দ্বিতীয় পুস্তিকাটি। এতে গ্রন্থকার নিম্নলিখিত পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ ও তথ্যবহুল আলোচনা ও পর্যালোচনা পেশ করেছেন।

১. তাসাওউফ বা পীর-মুরীদীর ব্যাপারে শিথিলতা।

২. তাসাওউফ বা পীর-মুরীদীর মূলতত্ত্ব এবং তার সঠিক পথ।

৩. তাসাওউফ বা পীর-মুরীদীর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি।

৪. পীর-মুরীদীর নেপথ্যে ধর্মহীনতা ও অধার্মিকতা।

৫. সমসাময়িক কয়েকজন ভ্রষ্ট পীরের পরিচয় ও কর্মকাণ্ড।

আলহামদুলিল্লাহ! গ্রন্থকার উল্লিখিত পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের অধীনে অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে তাসাওউফ সংক্রান্ত বিষয়াদির এত ব্যাপক সমাহার ঘটিয়েছেন যে, পাঠকমাত্রই মুগ্ধ হবেন। প্রথম পুস্তকে উল্লিখিত প্রশ্নগুলো ছাড়া এ বিষয়ে আরো যত ধরণের প্রশ্ন আমাদের মনে উদয় হয় বা আমরা যেসব প্রশ্নের সম্মুখীন হই তার সন্তোষজনক জবাবও এতে প্রদান করা হয়েছে।

সম্মানিত গ্রন্থকার কিতাবটি খুব তাহকীকের সাথে লিখেছেন। নিজের পক্ষ থেকে কিছু লেখার পরিবর্তে নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির উদ্ধৃতিতে লিখেছেন। তিনি এই কিতাবের প্রতিটি আলোচনায় কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণ পেশ করেছেন। আর তাফসীর ও ব্যাখ্যাস্বরূপ এনেছেন আকাবির ও মাশায়েখ উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন বাণী।

আইম্মায়ে হাদীসের তাহকীক ও গবেষণা অনুযায়ী সনদের দিক থেকে এ কিতাবের হাদীসগুলো নির্ভরযোগ্য। হাদীসশাস্ত্রের উসূল ও ধারা অনুযায়ী হাদীসগুলো 'সহীহ' বা 'হাসান' স্তরের, আর কিছু আছে করীব মিনাল হাসান। আর প্রয়োজনীয় স্থানে হাদীসের সাথে আরবীতে তার সনদের মানও উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়াও গ্রন্থকার এর অনুবাদটি অক্ষরে অক্ষরে শুনেছেন, পড়েছেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছেন। তাই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, অনুবাদে লেখকের ভাব ও উদ্দেশ্য পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়েছে। সাথে সাথে এটি বেশ কয়েকজন দক্ষ সাহিত্যিকের সম্পাদনাও লাভ করেছে।

সার্বিক বিবেচনায় গ্রন্থটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাবলীল উপস্থাপনায় একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রামাণ্যগ্রন্থ। আল্লাহ তা'আলা এ মূল্যবান গ্রন্থটির আরো মকবূলিয়্যাত দান করুন এবং পাঠকবৃন্দকে ভরপুর ফায়দা হাসিল করার তাওফীক নসীব করেন। আমীন!

লেখক : শাইখুল হাদীস, আশরাফুল মাদারিস, সতীঘাটা, সদর, যশোর

(২৩ পৃষ্ঠার পর; সাঈদ খান সাহেবের বয়ান)

আজ আমার ঈমান না হারাম কামাই থেকে বাঁচায়, না হারাম খানা থেকে বাঁচায়, আর না অহংকার থেকে বাঁচায়।

এক লোকের একটি মেয়ে ছিল। বৃদ্ধ বয়সের সন্তান। বড় সুন্দর। মেয়েটি হঠাৎ ৯/১০ বছর বয়সে মারা যায়। বৃদ্ধ লোকটি খুব কান্নাকটি করত। দিলের শান্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে! চোখের শীতলতা দূরীভূত হয়ে গেছে!! একরাতে সে স্বপ্নে দেখল, সে এক বিরাট ময়দানে অবস্থান করছে। তার পিছু পিছু এক বিশাল অজগর ছুটে আসছে। অজগরটি তাকে তাড়া করেছে। দৌড়াতে দৌড়াতে সে এক বৃদ্ধের দেখা পেল। ওই বৃদ্ধের কাছে সে অজগর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাহায্য চাইল। বৃদ্ধ বলল, সে নিজেই দুর্বল তাই সাহায্য করতে অক্ষম। তবে পরামর্শ দিল যে, সামনে পাহাড়ের কাছে গিয়ে দেখো, সেখানে তোমার কোন আমানত আছে কিনা। সে পাহাড়ে গিয়ে দেখল, সেখানে বহু ছোট ছোট শিশু। তাদের মধ্যে তার সেই মেয়েটাও আছে। মেয়েটা এক হাত তার গর্দানে রাখে আর অপর হাত সাপের দিকে বাড়িয়ে দেয়। এতে সাপটা পালিয়ে যায়। জিজ্ঞেস করা হলে তাকে বলা হল, বিশাল অজগর সাপটা তার বদ আমল, যা এই আকৃতিতে কেয়ামতের দিন আসবে। আর পথে দেখা পাওয়া বৃদ্ধ লোকটা তার নেক আমল কিন্তু তা এতই কমজোর যে, তাকে বাঁচাতে পারেনি। ব্যস, ঘুম ভাঙ্গার পর লোকটি তওবা করে নেককার হয়ে গেল।

এখন কথা হল, এই ঈমান কীভাবে হাসিল হবে? সাহাবায়ে কিরাম রা. দাওয়াতের ময়দানে তাযকেরা (উপদেশমূলক আলোচনা) করতেন। জান্নাত, জাহান্নামের কথা বলতেন ও শুনতেন। এতে তাঁদের ঈমান বাড়ত। আমরাও আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে লোকদেরকে ডাকব। আল্লাহর আযমত ও বড়ত্বের কথা বয়ান করব। পবিত্র কুরআনের ঘটনা শুনাব। রাতে উঠে দু'আ করব। আশা করা যায়, আল্লাহ আমাদের ঈমান বাড়িয়ে দিবেন। আজ ঘরের মধ্যে দুনিয়ার কিসসা। বাজারে দুনিয়ার কিসসা। মসজিদেও দুনিয়ার কিসসা। দুনিয়ার কিসসা কাফিরের ঘরে। দুনিয়ার কিসসা আমারও ঘরে। তাই আমার ঈমান কমছে। আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে বাতানো তারতীবে মেহনত করলে আল্লাহ তা'আলা আমার দিলকে ঈমানের নূর দ্বারা নূরানী করবেন এবং পুরা দীনের উপর চলার যোগ্যতা দান করবেন। এভাবে ঈমান বেড়েছে সাহাবাদের। এভাবে ঈমান বাড়বে আমাদের।

যে দাওয়াত দিবে তার ঈমান বাড়বে

তাই সবাইকে দাঈ বানাতে হবে। বাবাকে দাঈ বানাই। মাকে দাঈ বানাই। বিবিকে দাঈ বানাই। বাচ্চাকে দাঈ বানাই। গরীবকে দাঈ বানাই। ধনীকে দাঈ বানাই। তাজেরকে দাঈ বানাই। রিক্সাওয়ালাকে দাঈ বানাই। গাড়ীর ড্রাইভারকে দাঈ বানাই। ফৌজকে দাঈ বানাই। উজিরকে দাঈ বানাই।

মোটকথা, সবাইকে দাঈ বানাই; নিজের দেশেও বানাই, অন্য দেশেও বানাই। তাহলে পুরা দীনের উপর চলা সহজ হবে। তারপর হক আসবে এবং বাতেলকে টুকরা টুকরা করে দিবে।

এজন্য সবাই তৈরি হই। দাওয়াতের মেহনত নিয়ে সারা দুনিয়ায় ফেরার জন্য তৈরি হই।

[বি. দ্র. আয়াত-হাদীসসমূহের ইবারত ও হাওয়ালা অক্ষর-বিন্যাসকারী কর্তৃক সংযোজিত ও অনূদিত। অক্ষর-বিন্যাসকারী জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া হতে ২০০২, ২০১২ ও ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে হিফয, দাওরা ও ইফতা সমাপনকারী মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন ক্বাসিম (বয়ানলেখকের মেজো সাহেবযাদা)]

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম

মীযান মুহাম্মাদ হাসান

কদিন আগে এক জায়গায় বেড়াতে গেলাম। কেবলই মেহমানখানায় বসেছি। ছোট একটি বাচ্চা কাছে এলো। বয়স তিন কি চার হবে। নাম জানতে চাইলে ভাঙা ভাঙা শব্দে নাম বলল। একটু পর আমাকে বলছে, তোমার বড় মোবাইল কো? বললাম, নাই! ছোট্টা আছে। একটু পর আবার কাছে এলো, তোমার মোবাইলে কার্টুন আছে? বললাম, না তো! কিছুক্ষণ পর তার কাছে জানতে চাইলাম, তুমি সূরা পারো? শোনাও তো! কী বুঝলো কে জানে! ভাঙা অস্পষ্ট শব্দে যা বলল, শুনে আমি তো লা-জবাব! সে বলল, 'মনেরই ক্যানভাসে ভেসে ওঠে তোমার ছবি।' জিজ্ঞেস করলাম, কে শিখিয়েছে? বলল, ফুপি। একটু পর পাঁচ কি ছয় বছর বয়সের আরেকটি বাচ্চা কাছে এলো। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কী পারো? সে শোনালো, 'আমি দেখিনি তোমায়, চোখেরই তারায়, তবুও তোমায় ভালোবেসেছি।' আমি তো অবাক! বলে কি এসব? গান না গজল! পাঠক! লক্ষ করেছেন শিশুদের অবস্থা? বোল ফোটার আগেই গান শিখে গেছে! এখনো পুরো কথা বলা শেখেনি; অথচ গান শিখে ফেলেছে। চিন্তা করা যায়! একটু ভেবেছেন কি কখনো, আমাদের বাচ্চারা এসব কী শিখছে? হায়! তাহলে বলুন তো, আমাদের আগামী প্রজন্মের কী হবে? তবে কি আমাদের শিশুদের ওপর আমাদেরই গাফলতি, উদাসীনতা, আমলী পদস্খলন ও নাফরমানীর ছাপ পড়ছে? পাপ যে কত ভয়াবহ তা-ও কি আমরা ভুলে গেছি? আর কত বেহুশ ও অচেতন হয়ে পড়ে থাকবো আমরা?! এখনো কি আমাদের জেগে ওঠার সময় হয়নি?

২.পাশের বাড়ির দুই বাচ্চা। সারাক্ষণ কার্টুন নিয়ে ব্যস্ত থাকে। মাম্মি ছাড়া 'মা' ডাক তাদের মুখে কখনো শুনেছি বলে মনে পড়ে না। আর কাউকে বিদায় জানাতে আর কিছু না বললেও 'টাটা' তারা বলবেই! এমনকি দিব্যি হিন্দি বলে বেড়ানো বাচ্চারও তো অভাব নেই আমাদের আশপাশে। আমি একদিন একজনের সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করলাম, সে আমার ভুল ধরতে শুরু করল। বলল, এটা নাকি 'বরিশালের হিন্দি ভাষা।' হাসি পেলেও আমি বিষয়টি নিয়ে ভাবলাম। চিন্তা করলাম, এ কী অবস্থা এদের? লক্ষ করেছেন, মাতৃভাষা শেখার আগেই দ্বিতীয় আরেকটি ভাষা কিন্তু এরা ঠিকই রপ্ত করে ফেলেছে। অথচ বিশুদ্ধ মাতৃভাষাটা আগে শেখা উচিত ছিল। আর এভাবেই আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তথা সন্তানদেরকে মাতৃভাষা থেকে বিমুখ করে আরেকটি ভাষায় অভ্যস্ত করে তুলছি! এভাবে চলতে থাকলে সে দিন বেশি দূরে নয়, যে দিন বাংলাভাষার কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। লক্ষ করুন, অন্নদা শঙ্কর রায় আশির দশকের মাঝামাঝি বলেছিলেন– 'তোমাদের দেশে যেভাবে কিন্ডারগার্টেন ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গড়ে উঠছে, তা কিন্তু বাংলাভাষার জন্য আশঙ্কাজনক!' তিনি আরও বলেছিলেন, যারা ইংরেজী মাধ্যমে লেখাপড়া করে তারা কতজন বাংলা শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে জানে? তারা রবিঠাকুরকে 'ট্যাগর' নামে, আর নজরুলকে 'রেবেল পয়েট' নামে চেনে। এবার চিন্তা করুন, আমাদের আগামী প্রজন্ম তবে বাংলাভাষা ও সাহিত্য থেকে কত দূরত্বে চলে যাচ্ছে!

৩. সম্প্রতি ইউনেস্কোর এক জরিপ থেকে জানা যায়, একুশ শতকের শেষ অবধি বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ভাষাগুলোর শতকরা ৪০ ভাগই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কেবল ইংরেজী, চীনা ও স্প্যানিশ ভাষার মতো সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা টিকে থাকবে। একুশ শতকে বিশ্বায়ন, মুক্তবাজার, অর্থনীতি, আকাশ-সংস্কৃতি ও অবাধ তথ্য প্রবাহের ফলে তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ ভাষাই হুমকির মুখে। আর বাংলা ভাষার প্রতি যে অনাগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাতে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম এই ভাষাটি এ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে কিনা, তা নিয়েই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন গবেষকরা। তারা মনে করেন, তৃতীয় বিশ্বে সে সব ভাষাই টিকে থাকবে– যারা মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, রক্ষণশীল ও যত্নবান। পক্ষান্তরে মাতৃভাষার প্রতি যাদের শ্রদ্ধা নেই, আছে অকারণে বিদেশি ভাষা মিশ্রণের প্রবণতা, তাদের ভাষা টিকে থাকা দুষ্কর। স্বাধীনতার পর যখন এ দেশের রাস্তাঘাট, দোকানপাট ও স্থাপনার নাম বাংলায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল তখন আমাদের হীনম্মন্যতার কারণে আবার সেগুলো ইংরেজিতে পরিবর্তিত হতে দেখে বিশিষ্ট নজরুল গবেষক, ভাষাসৈনিক ও অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম খুব আক্ষেপ করে লিখেছিলেন– 'ইংরেজ আমল থেকেই সামাজিক অনুষ্ঠানাদি, বিয়ে, পুনর্মিলনী ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র বাংলা ভাষাতেই রচিত হতো। কিন্তু তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের আত্মমর্যাদাবোধ বলতে কিছু নেই।' সত্যিই যদি আমাদের আত্মমর্যাদাবোধ বলতে কিছু থাকতো, তবে আমরা অবশ্যই মাতৃভাষার প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করতাম না। সুতরাং আমরা যদি এখনো সচেতন না হই, বিশুদ্ধ বাংলাভাষা চর্চার প্রতি মনোযোগী না হই তবে আমাদের এই উদাসীনতা এবং মাতৃভাষার প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণই আমাদের ভাষা-সংস্কৃতি থেকে বাংলাভাষা মুছে দেবে। আসুন! আমরা মাতৃভাষার প্রতি যত্নবান হই এবং এর সঠিক পরিচর্যা ও বিকাশের প্রতি দৃষ্টি দিই।

লেখক : পরিচালক, শায়খ যাকারিয়া ইনস্টিটিউট গাজীপুর

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) সাতমসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোনে মাসআলা জানতে : ০১৯১৪৬২৭৬১৩ (বাদ আসর থেকে রাত ১০টা)

মুহাম্মাদ সুহাইল
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

৩১৫ প্রশ্ন : কেউ যদি এভাবে যাকাত আদায় করে যে, আমি এই দশ হাজার টাকা ফেনীর আব্দুল্লাহর কাছে পাঠাব, যেন সে আমার পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করে দেয়। তারপর সে যদি এই দশ হাজার টাকা বিকাশ করে পাঠিয়ে দেয়, তাহলে যাকাত আদায় হবে কিনা? যদি আদায় না হয় তাহলে তার করণীয় কি?

উত্তর : হ্যাঁ, এভাবে যাকাত আদায় করলে তা আদায় হয়ে যাবে। তবে শুধু বিকাশ করে টাকা পাঠিয়ে দেয়ার দ্বারাই যাকাত আদায় হবে না; বরং ফেনীর আব্দুল্লাহর কাছে বিকাশের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর পর যখন আব্দুল্লাহ উক্ত টাকা বিকাশ থেকে ক্যাশআউট করিয়ে যাকাতের কোন খাতে দিয়ে দিবে তখনই কেবল যাকাত আদায় হবে; এর আগে নয়। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২০৯, ফাতাওয়া শামী ২/২৭০, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৬/১০১, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/১৪৬, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৫/১৮৮)

মাজেদুল ইসলাম
মাইজদী, নোয়াখালী

৩১৬ প্রশ্ন : জনৈক মহিলার স্বামী চারজন সন্তান রেখে ইন্তেকাল করেন। তার একটি ব্যবসা ছিলো এবং ব্যবসা অনুপাতে সেই পরিমাণ ঋণও রয়েছে। বর্তমানে মহিলাটি একটি স্কুলে চাকুরী করে। তার বেতন ২২,০০০/- (বাইশ হাজার) টাকা। তার চার সন্তানের ভরণ-পোষণ, লেখা-পড়ার খরচ চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে উক্ত সন্তানরা যাকাতের টাকা গ্রহণ করতে পারবে কিনা? জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে যাকাতের টাকা গ্রহণের যোগ্য ঐ সকল লোক যাদের নিত্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও ঋণমুক্ত সম্পদ চাই আসবাবপত্র হোক কিংবা জায়গা-সম্পত্তি বা যেকোন সামগ্রী নেসাব পরিমাণ তথা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা তার সমপরিমাণ নগদ অর্থ (যা বর্তমানে প্রায় ৪০,০০০/- টাকা) থেকে কম থাকে।

সুতরাং প্রশ্নোল্লিখিত সূরতে উক্ত সন্তানরা যদি উল্লিখিত নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হয়, তাহলে যাকাতের টাকা গ্রহণ করতে পারবে। (সূরা তাওবা- ৬০, সহীহ বুখারী; হাদীস ১৩৯৫, সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৯, সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ১৭৮৩, শরহু মা'আনিল আসার ৪/৩৭৩, ফাতাওয়া শামী ২/৩৩৯, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/১৮৭, ১৮৯, কিতাবুন নাওয়াযিল ৭/৫২-৫৩)

আব্দুস সামাদ
কাপাসিয়া, গাজীপুর

৩১৭ প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি (তাবলীগ জামা'আতের বর্তমান পরিস্থিতিতে সা'দ সাহেবের ভুলের পক্ষ নিয়ে আমাদের দেশের) উলামায়ে কেরামকে বলে, এরা ছাগল; এদেরকে ঘাস দাও; এরা ঘাস খাওয়ার উপযুক্ত, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে ঐ ব্যক্তির বিধান কি?

উত্তর : উলামায়ে কেরামের সম্মানে কুরআন-হাদীসে বহু আয়াত ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, একজন আলেমের সম্মান একজন আবেদের থেকে এত বেশি, যেমন তোমাদের (সাহাবীদের) সবচেয়ে সাধারণ ব্যক্তির তুলনায় আমার সম্মান বেশি। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ২৬৮৫)

অন্য হাদীসে বলেন, যে আলেমদেরকে সম্মান করল না, সে আমার উম্মত না। (মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ২২৭৫৫)

অপর হাদীসে কুদসীতে বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সাথে বিদ্বেষ রাখে, তার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দিই। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৬৫০২)

তাই স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদেরকে সম্মান দিয়েছেন, আলেম হওয়ার কারণে বা কোন বিষয়ে তাদের ইলমী সিদ্ধান্তের কারণে তাদেরকে গালমন্দ করা এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা চরম দুর্ভাগ্যের বিষয় এবয় নিজের আখেরাত ধ্বংসের কারণ। এহেন জঘন্য কাজ থেকে পুরোপুরিভাবে বেঁচে থাকতে হবে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে উল্লিখিত কথা বলে, তাহলে তার মারাত্মক গুনাহ হবে; যা থেকে তওবা করা অপরিহার্য। আর তওবা না করে এ জাতীয় কথা বলতে থাকলে সে ফাসেক সাব্যস্ত হবে।

আর আলেম-উলামাকে এভাবে ঢালাওভাবে ছাগল বললে তার ঈমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে। সুতরাং সতর্কতামূলক তাকে পুনরায় ঈমান নবায়ন করতে হবে এবং বিবাহও নবায়ন করতে হবে। (সহীহ বুখারী; হাদীস ১০০, ৬৫০২, সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৬৭৩, মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ২২৭৫৫, সুনানে ত্বাহাবী; হাদীস ১৩২৮, মুসতাদরাকে হাকেম; হাদীস ৪২১)

মাহফুজুর রহমান
পশ্চিম মনিপুর, মিরপুর, ঢাকা

৩১৮ প্রশ্ন : (ক) হক্কানী আলেমগণকে ভক্তি ও মহব্বত করা ঈমানের জরুরী দাবী এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা ঈমানের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক বিষয়। অধম সবিনয়ে জানতে আগ্রহী যে, হক্কানী আলেম বলতে কি বুঝায় বা হক্কানী আলেম হওয়ার সর্বনিম্ন মানদণ্ড বা যোগ্যতা কী?

(খ) উলামায়ে কেরামের প্রতি মহব্বত ও বিদ্বেষ বলতে কি বুঝায়? কিছু উদাহরণ দিলে ভালো হয়।

(গ) অধমের পরিচিত কয়েকজন মসজিদের ইমাম সাহেব আছেন, যারা প্রত্যেকেই কোন না কোন কওমী মাদরাসার ফাযেল এবং বর্তমানে উস্তাদ। আলহামদুলিল্লাহ, অধম উলামায়ে কেরামকে মহব্বত ও সম্মান করার চেষ্টা করে আসছে এবং আমি মনেপ্রাণে এটা বিশ্বাস করি যে, যমীনের উপরে হক্কানী উলামায়ে কেরামই আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা এবং শ্রেষ্ঠ মাখলুক। এরই অংশ হিসেবে উল্লিখিত মসজিদের ইমাম সাহেবগণকে সাধ্যমত সালাম-কালাম, হাদিয়া, দুনিয়াবী ইকরাম করার চেষ্টা করি আলহামদুলিল্লাহ। তবে তাদের

কাউকে যখন দেখতে পাই যে, তিনি মসজিদ কমিটির রোষানলে পড়ে চাকুরী হারানোর আশঙ্কায় বিদ'আতী মীলাদের অনুষ্ঠানে চুপচাপ বসে থাকেন এবং শেষে দু'আ করেন এবং মসজিদের উক্ত বিদ'আতী কর্মকাণ্ড বন্ধ করার কোন চেষ্টা করছেন না তখন তার প্রতি মন থেকে শ্রদ্ধা ও মহব্বত আসতে চায় না।

অপর একজন ইমাম সাহেবের সবকিছুই ভালো লাগে আলহামদুলিল্লাহ; কিন্তু যখন থেকে দেখতে পেলাম যে, তিনি নিজের ওয়েবসাইটে দাওয়াতের নিয়তে তার মাহফিলের ভিডিও পোস্ট করে প্রচার করছেন, ফেসবুকে প্রাণীর ছবি পোস্ট করছেন (তার মতে দীনী দাওয়াতের নিয়তে), তখন তার প্রতি পূর্বের যে আন্তরিক ভক্তি ও মহব্বত ছিলো তা থাকছে না।

যদিও তাদের সাথে বাহ্যিক সম্মান ও ইকরাম বজায় রাখার চেষ্টা করছি, কিন্তু অন্তর থেকে তাদের প্রতি যে ভক্তি ও মহব্বতের ঘাটতি দেখা দিয়েছে এটাকে কি উলামায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ আখ্যা দেয়া যাবে? এ অবস্থায় একজন সাধারণ ব্যক্তি হিসেবে আমার করণীয় কী?

উত্তর : (ক) একজন হক্কানী আলেম ন্যূনতম এ বিষয়গুলোর ধারক হবেন–

১. তিনি নির্ভরযোগ্য ধারাক্রমে কুরআন ও হাদীসের ইলমের অধিকারী হবেন।
২. আকীদাগত দিক দিয়ে তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অনুসারী হবেন এবং সব ধরনের বিদ'আতী ও বাতিল চিন্তা-চেতনা মুক্ত হবেন।
৩. সর্ব বিষয়ে তিনি সুন্নাতের অনুসারী হবেন।
৪. তিনি পার্থিব মোহ থেকে মুক্ত হয়ে মুখলিস ও ইনাবাত ইলাল্লাহর ধারক হবেন।
৫. সর্বোপরি তিনি আহকামে শরঈয়্যার পরিপূর্ণ পাবন্দ হবেন।

আর আলেমগণ যেহেতু নবীদের ওয়ারিস। তাই একজন আলেম ব্যক্তিগত জীবনে যেমন উপরের গুণাবলীর ধারক হবেন তেমনিভাবে সামাজিক ক্ষেত্রেও তিনি নববী দায়িত্বের প্রতি যত্নবান হবেন। সেই সুবাদে উলামায়ে কেরামের দুই ধরনের দায়িত্ব রয়েছে–

প্রথমত সার্বক্ষণিক দায়িত্ব : তা হলো প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে জনগণকে সাধ্যমত ফরযে আইন পরিমাণ ইলম শিক্ষা দিবেন। এটিকে মোটামুটি ছয়টি বিষয়ে ভাগ করা যায়। যথা–

১. ঈমানিয়্যাত শিক্ষা দেয়া তথা আল্লাহ, রাসূল, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, আখেরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি সম্পর্কে আকাইদ শিক্ষা দিবেন, যাতে করে তারা এ সকল বিষয়ের সঠিক আকীদা পোষণ করতে পারে। তাদেরকে কুফরী আকীদা ও বাতিল বিশ্বাসের ব্যাপারেও অবগত করবেন যাতে তারা সে সকল বিষয় থেকে আপন ঈমানকে হেফাযত করতে পারে।
২. ইবাদাত তথা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, বিবাহ-শাদী, কাফন-দাফন ইত্যাদি বিষয়ের মাসাইল ও সুন্নাত শিক্ষা দিবেন।
৩. মু'আমালাত বা হালাল-হারামের ইলম তথা ব্যবসা, লেনদেন এবং উপার্জনের সঠিক পদ্ধতি ও মাসাইল শিক্ষা দিবেন।
৪. মু'আশারাত বা হুকূকুল ইবাদ তথা বান্দার হক; যেমন সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার হক, পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের হক, আত্মীয়-স্বজনের হক, প্রতিবেশীর হক ও পারস্পারিক আচার-ব্যবহার ইত্যাদি শিক্ষা দিবেন।
৫. আত্মশুদ্ধি বা আত্মার দশটি রোগের ও দশটি গুণের ইলম ও তার চিকিৎসার উপায় শিক্ষা দিবেন।
৬. দা'ওয়াত ও তাবলীগ তথা আখেরী নবীর উম্মত হওয়ার কারণে যে কোন সহীহ পন্থায় এ উম্মতের উপর দা'ওয়াতের কাজ করা ফরযে আইন। সুতরাং তিনি জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দিবেন।

দ্বিতীয়ত এমন দায়িত্ব যা প্রয়োজন সাপেক্ষে মাঝে-মাঝে আদায় করতে হয়। তা হলো, ইসলামের বিরুদ্ধে, দীনের বিরুদ্ধে যখনই কোন ব্যক্তি বা শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে দীনের লেবেলে হোক বা বদদীনের মোড়কে হোক তখনই তা দমনে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং জনসাধারণকে এর থেকে বাঁচানোর জন্য কার্যকর ভূমিকা রাখবেন চাই তা বয়ান-বক্তৃতার মাধ্যমে হোক বা লেখালেখির মাধ্যমে হোক বা জনমত তৈরির মাধ্যমে হোক। (সূরা ফাতির- ২৮, তাফসীরে কুরতুবী ৮/২৯৩, ১৪/৩৪৩, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪/২৩৭, সূরা বাকারা- ১২৯, সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ২৯, ৩০, শরহে সহীহ ইবনে হিব্বান ৪/২৭)

(খ) নবীদের প্রতি মহব্বত রাখা ঈমানের অংশ। কারো অন্তরে যদি আল্লাহর রাসূলের প্রতি মহব্বত না থাকে তাহলে তার ঈমান ত্রুটিমুক্ত নয়। আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সেকল উলামায়ে কেরামকে নবীদের ওয়ারিস বলেছেন– যারা নববী দায়িত্বগুলো আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। তাই উলামায়ে কেরামের প্রতি অন্তরে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও মহব্বত রাখাও ঈমানের দাবী এবং উলামায়ে কেরামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ মনোভাব ও বিদ্বেষ পোষণ করা ঈমানের জন্য ক্ষতিকর।

উলামায়ে কেরামের প্রতি মহব্বতের অর্থ হলো তাদেরকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করা, যার কারণে তাদের কথাগুলো মানা সহজ হয় এবং অন্তরও সেগুলো মানতে প্রস্তুত থাকে। এর বাহ্যিক উদাহরণ হলো, দীনী কাজে উলামায়ে কেরামকে সাধ্যমত সহযোগিতা করা এবং তাদের ডাকে সাড়া দেয়া। দীনী বিষয়ে উলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করে আমল করা এবং তাদের সিদ্ধান্তকে মেনে নেয়া।

আর আলেমদের প্রতি বিদ্বেষের মানে হলো, আলেম হওয়ার কারণে কারো সাথে শত্রুতা বা বৈরী ভাব রাখা। এর বাহ্যিক উদাহরণ হলো, উলামায়ে কেরামকে গালি দেয়া, তাদের গীবত করা, দীনী কাজে বাঁধা সৃষ্টি করা, সামাজিকভাবে তাদেরকে ছোট মনে করা, তাদের ব্যাপারে কটূক্তি করা, বিশেষত আজকাল দেখা যায় যে, কোন জেনারেল শিক্ষিত লোক কুরআন শরীফের কিছু অংশের বাংলা তরজমা পড়ে, কিছু হাদীসের অনুবাদ পড়ে বা দীনী কোন কাজে সময় দিয়ে শরয়ী বিষয়ে নিজেকে বড় জ্ঞানী ভাবতে থাকে এবং সে নিজেকে আলেমদের সাথে তুলনামূলক অবস্থানে দাঁড় করাতে চায় এবং উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করে। এ ধরনের বিষয় থেকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিরত থাকতে হবে। অন্যথায় ঈমান আশঙ্কা থেকে মুক্ত হবে না। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৭৮০, আল-মাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা লিল-বাইহাকী; পৃষ্ঠা ২৬৯, সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৩৬৪১, ফাইযুল কাদীর ৫/৩৮৯)

(গ) মুহতারাম! উলামায়ে কেরামের প্রতি আপনার মহব্বত এবং সম্মানবোধ আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন, আখেরাতে নাজাত ও মুক্তির উসীলা হিসেবে মঞ্জুর করেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত উলামায়ে কেরামের সাথে

থেকে দীন-দুনিয়ার তারাক্কী অর্জন করার তাওফীক দান করেন। উলামায়ে কেরামের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখাই জনসাধারণের কর্তব্য এবং তাদের দায়িত্ব হলো তারা উলামায়ে কেরামকে অনুসরণ করে যাবে এবং সর্ববিষয়ে তাদের সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দিবে। কোন আলেম ততক্ষণ পর্যন্ত অনুসরণযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন, যতক্ষণ না তিনি নিজ থেকে প্রকাশ্যে কোন বিদ'আতী কর্মকাণ্ড বা কোন স্পষ্ট কবীরা গুনাহে লিপ্ত হন।

নাহী আনিল মুনকার বা অসৎ ও গুনাহের কাজে বাধা প্রদান করাও ঈমানের দাবী, তবে এর তিনটি স্তর রয়েছে–

১. ক্ষমতা বা শক্তি প্রয়োগ করে তা বন্ধ করার চেষ্টা করা।
২. মুখে নিষেধ করা।
৩. উক্ত খারাপ কাজের প্রতি অন্তরে ঘৃণা পোষণ করে মনে মনে ফিকির করা যে, উক্ত গর্হিত কাজ কীভাবে বন্ধ করা যায়?

ইসলামী শরীয়তে চিত্রাঙ্কন ও ফটো তোলা একটি মারাত্মক কবীরা গুনাহ। যার ব্যাপারে হাদীসে পাকের মধ্যে ধমকি ও লা'নতের কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে বর্তমান ডিজিটাল ক্যামেরায় ধারণকৃত চিত্র বা ছবি, যা স্থায়ীভাবে কোন কিছুর উপর চিত্রায়িত হয়নি, তার হুকুম কী হবে এ নিয়ে উলামায়ে কেরামের তিনটি মত রয়েছে।

এক. কতক আলেম এটাকে তাসবীরের হুকুমে সাব্যস্ত করেছেন।

দুই. কতক আলেমের মতে এর উপর তাসবীরের বিধান প্রয়োগ হবে না।

তিন. কতক আলেম বলেন, এটা তাসবীর তো বটে; কিন্তু যেহেতু এর তাসবীর হওয়া না হওয়া নিয়ে একাধিক ফিকহী মতামত রয়েছে, এজন্য এটা মুজতাহাদ ফীহ হয়ে গেছে।

তবে আমাদের মত হলো, ছবির ব্যাপারে শরীয়তে যে ধরনের কঠিন ধমকি এসেছে তার আলোকে একান্ত অপারগতা ছাড়া ছবির ব্যবহারের বৈধতা সম্ভব নয় এবং এর মধ্যেই যে অধিক সতর্কতা সেটা একেবারেই স্পষ্ট।

প্রশ্নে বর্ণিত প্রথম আলেম যিনি হয়তো প্রচলিত মীলাদ পছন্দ করেন না, তা সত্ত্বেও মীলাদের অনুষ্ঠানে বাধা দিচ্ছেন না। তার করণীয় ছিল, তিনি এলাকাবাসী ও মুসল্লীদেরকে বুঝিয়ে বিদ'আতী কাজ থেকে বিরত রাখবেন। যেহেতু তিনি তা করছেন না, তাই এ বিষয়ে তার অনুসরণ করা যাবে না ঠিক; তবে তার প্রতি আপনার বাহ্যিক সম্মান ও ভক্তি বজায় রাখতে হবে। আর যদি সম্ভব হয় তাহলে স্থানীয় যিম্মাদার উলামায়ে কেরামকে উক্ত ইমামের প্রতি পূর্ণ সম্মান বজায় রেখে বিষয়টি অবগত করা যেতে পারে, যাতে তারা উক্ত ইমাম সাহেবের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। আর দ্বিতীয় ইমাম সাহেব যিনি দাওয়াতের উদ্দেশ্যে তার দীনী প্রোগ্রামগুলোর ভিডিও ধারণ করে আপলোড করেন, যেহেতু কতক উলামায়ে কেরামের এ ব্যাপারে শরয়ী তাসবীর না হওয়ার একটি মত রয়েছে, তাই তিনি হয়ত সে মতের অনুসারী। কাজেই এ ব্যাপারে তার সাথে বাড়াবাড়ির দরকার নেই। তার প্রতি আপনার ভক্তি-শ্রদ্ধা কম হলে তা অন্তরেই রাখতে হবে। কথায় বা কাজে তার বিরুদ্ধাচরণ করার প্রয়োজন নেই।

মনে রাখতে হবে, উলামায়ে কেরামের মধ্য হতে যারা এ মত পোষণ করেন, তারা কেবল ডিজিটাল ছবির কাঠামোগত দিকটি বিশ্লেষণ করত এটিকে শরীয়তনিষিদ্ধ ছবির অন্তর্ভুক্ত করেননি। নতুবা খামাখা ছবি তোলা এবং ফেসবুকে প্রাণীর ছবি পোস্ট করা তাদের মতেও বিলকুল পরিত্যাজ্য।

আর যেহেতু আপনার মহব্বতের ঘাটতি বিশিষ্ট আলেমগণের মতে তাদের শরীয়ত অসমর্থিত কোন কাজের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে হয়ে থাকে তাই এটাকে উলামায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ বলা যায় না। কাজেই এ নিয়ে দুশ্চিন্তার দরকার নেই। তবে সতর্ক থাকবে হবে, অভক্তি যেন বিদ্বেষের আকার ধারণ না করে। (সূরা যুমার- ৯, আল-মাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা লিল-বাইহাকী; পৃষ্ঠা ২৬৯, ইমদাদুল আহকাম ২২৬)

বিশরে হাফী
আজিজ মহল্লা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

৩১৯ প্রশ্ন : (ক) বর্তমানে ইন্টারনেট ভিত্তিক কিছু ওয়েব ডিজাইনিং সাইট রয়েছে, যেখানে মানুষ বিভিন্ন ধরনের ডিজাইনের আবেদন করে পছন্দমাফিক ডিজাইন পেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কিছু কিছু ওয়েবসাইটের অ্যাডমিন নিজের ডিজাইনের মান ধরে রাখার জন্য নির্দিষ্ট কিছু দেশের ডিজাইনারদের মাধ্যমে কাজ করিয়ে থাকে। সেখানে বাংলাদেশের ডিজাইনারদের কাজ করার অনুমতি নেই, চাই সে যতই প্রফেশনাল হোক।

এখন প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশী কোন ডিজাইনারের যদি নিজের উপর আস্থা থাকে যে, সে ভোক্তার কাঙ্ক্ষিত দেশের মান অনুযায়ী মানসম্পন্ন ডিজাইন করতে পারবে, তাহলে তার জন্য অনুমোদিত দেশের ডিজাইনারের আইডি ব্যবহার করে সেই ওয়েবসাইটে কাজ করা কি বৈধ হবে?

(খ) সরকার কোন ওয়েবসাইটের প্রবেশপথ সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়ার পর দেশের কোন নাগরিক যদি ইন্টারনেট দক্ষতাবলে বিকল্প কৌশল অবলম্বন করে তাতে প্রবেশ করে, তাহলে তা জায়েয হবে কি?

উত্তর : (ক) কোন বাংলাদেশী ডিজাইনারের জন্য অনুমোদিত দেশের ডিজাইনারের আইডি ব্যবহার করে কাজ করা বৈধ হবে না। কেননা ওয়েবসাইট কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে অননুমোদিত দেশের (বাংলাদেশের) ডিজাইনার হিসেবে কাজ করা তার সঙ্গে প্রতারণার শামিল। আর একজন মুসলমানের জন্য অন্যের সঙ্গে প্রতারণা করা জায়েয হবে না। (সূরা নিসা- ২৯, সহীহ মুসলিম; হাদীস ১০২, আল-মাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ৩১/২১৯)

(খ) শরয়ী বিধান অনুযায়ী সরকার যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম পরিপন্থী কোন বিধি-নিষেধ জারী করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সরকারের আইন-কানূন মেনে চলা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। তাই সরকার যদি দেশের শৃঙ্খলা রক্ষার্থে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য তা মান্য করা জরুরী।

অতএব সরকার কর্তৃক বাস্তবসম্মত শৃংখলার স্বার্থে কোন ওয়েবসাইটের প্রবেশপথ সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়ার পর কোন নাগরিকের জন্য বিকল্প কৌশল অবলম্বন করে তাতে প্রবেশ করা জায়েয হবে না।

তাছাড়া বিকল্প কৌশল অবলম্বন করার কারণে সরকারের আদেশ অমান্য করা হচ্ছে, যার ফলে সরকারী আইন অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর একজন মুসলমানের জন্য স্বেচ্ছায় অনর্থক কাজে লাঞ্ছনার শিকার হওয়ার আশঙ্কা তৈরি করা জায়েয নেই। (সূরা নিসা- ৫৯, সহীহ বুখারী; হাদীস ৩৬০৩, ৭১৪২, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ২২৫৪, আকীদাতুত ত্বাহাবী; পৃষ্ঠা ২৪, মা'আরিফুল কুরআন ২/৪৫২)

মুহাম্মাদ মুহসিন
স্টাফ, সোনার তরী লঞ্চ, সদরঘাট-চাঁদপুর নৌরুট

৩২০ প্রশ্ন : (ক) আমি লঞ্চের একজন স্টাফ। আমাকে সদরঘাট-চাঁদপুর

নৌপথে প্রতিদিন যাতায়াত করতে হয়। সরকারী হিসাব অনুযায়ী সদরঘাট থেকে চাঁদপুরের দূরত্ব ৪৮ মাইল/৭৮ কি.মি.। এদিকে আমার বাড়ি চাঁদপুর থেকে ২৫ কি.মি. দূরে। এমতাবস্থায় আমি কখন নামায কসর করব আর কখন পূর্ণ নামায আদায় করব?

(খ) যারা বাস বা কোন নৌযানের স্টাফ। প্রতিদিনই ৪৮ মাইল বা তার চেয়ে দূরত্বের সফরে যাতায়াত করতে হয় তারা নিজের এলাকার সীমানায় প্রবেশ করা ছাড়া মুকীম হওয়ার কোন সূরত আছে কিনা?

(গ) নৌপথে, সড়কপথে ও আকাশপথে যাতায়াতকারীর ক্ষেত্রে শরয়ী মুসাফির হওয়ার জন্য দূরত্বের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিধান, নাকি একই বিধান?

(ঘ) লঞ্চের যাত্রী বা স্টাফগণ লঞ্চ চলাকালীন লঞ্চে জুমু'আর নামায আদায় করতে পারবে কিনা? এর জন্য কী কী শর্ত জরুরী?

উত্তর : (ক) নৌপথের ক্ষেত্রে মুসাফির হওয়ার জন্য ৪৮ মাইলের হিসাব জরুরী নয়; বরং ইঞ্জিন বিহীন নৌকা বাতাস স্বাভাবিক থাকলে মাঝিদের নিয়ম মাফিক নৌকা চালালে তিন দিনে সাধারণত যতটুকু দূরে যেতে পারে ততটুকু দূরের নিয়তে নিজের গ্রাম বা শহর ত্যাগ করলে মানুষ মুসাফির গণ্য হয়। আর এরচে কম দূরত্বে গেলে সে ব্যক্তি মুসাফির গণ্য হবে না।

বি.দ্র. আমাদের জানামতে একটা ইঞ্জিন বিহীন নৌকা তিনদিনে স্বাভাবিকভাবে ৪৮ মাইল বা ৭৮ কি.মি.-এর বেশি যেতে পারে না। কাজেই বর্ণিত ক্ষেত্রে আপনি ঢাকায় আসার উদ্দেশ্যে নিজ গ্রাম হতে বের হওয়ার পর থেকে পুনরায় গ্রামে প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত মুসাফির থাকবেন। (সূরা নিসা- ১০১, মুআত্তা ইমাম মালেক রহ.; হাদীস ১৯৩৩, সহীহ মুসলিম; হাদীস ৬৮৭, ফাতাওয়া শামী ২/১২১, ১২৩, ১৩১, বাদায়িউস সানায়ে' ১/৯৪, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/১৩৮, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৫৭৯, জাওয়াহিরুল ফিকহ ৩/৮৩)

(খ) শরয়ী দূরত্বে সফর চলাকালীন যদি বাস বা নৌযানের কোন স্টাফ নিজ এলাকায় প্রবেশের পূর্বেই একাধারে ১৫ দিন বা তার থেকে বেশি দিন কোন বসবাসযোগ্য স্থানে থাকার নিয়ত করে থাকা শুরু করে তাহলে সে মুকীম বলে গণ্য হবে। অন্যথায় সে মুসাফির বলে গণ্য হবে। (বাদায়িউস সানায়ে' ১/৯৭, ফাতাওয়া শামী ২/১২১, ১২৬, আল-বাহরুর রায়িক ২/১৪২, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/১৪৪)

(গ) সড়কপথ ও আকাশপথে ৪৮ মাইল বা তার থেকে বেশি দূরের নিয়তে নিজের গ্রাম বা শহর ত্যাগ করলে সে ব্যক্তি শরয়ী মুসাফির বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে উভয়ের দূরত্বের মাঝে কোন ব্যবধান নেই। আর নৌপথের বেলায় মুসাফির হওয়ার জন্য ৪৮ মাইলের হিসাব জরুরী নয়; বরং ইঞ্জিন বিহীন নৌকা বাতাস স্বাভাবিক থাকলে মাঝিদের নিয়ম মাফিক নৌকা চালালে তিনদিনে সাধারণত যতটুকু দূরে যেতে পারে ততটুকু দূরের নিয়তে নিজের গ্রাম বা শহর ত্যাগ করলে মানুষ মুসাফির গণ্য হয়। আর এরচে কম দূরত্বে গেলে সে ব্যক্তি মুসাফির গণ্য হবে না। (ফাতাওয়া শামী ২/১৩১, বাদায়িউস সানায়ে' ১/৯৪, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/১৩৮, শরহু ফিকহিন নাওয়াযিল; পৃষ্ঠা ১৩৭, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৫৭৯, জাওয়াহিরুল ফিকহ ৩/৮৩, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৫৯১, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৮২)

(ঘ) জুমু'আর দিন লঞ্চের যাত্রী এবং স্টাফগণের জন্য লঞ্চ চলাকালীন লঞ্চে জুমু'আর নামায আদায় করা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ নয়। বরং তারা যোহরের নামায আদায় করে নিবে। জুমু'আর নামায আদায় করার জন্য শহর বা বড় গ্রাম হওয়া আবশ্যক। (ফাতাওয়া শামী ২/১৩৭, ১৫৭, ফাতাওয়া কামিল ২/২৪১, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/৩৯৪)

মাওলানা হুসাইন
হাজারীবাগ, ঢাকা

৩২১ প্রশ্ন : (ক) মাদরাসার লিল্লাহ ফান্ডের নামে ধনীদের কাছ থেকে যাকাত কালেকশন করে তা মাদরাসার উন্নয়ন কাজে ব্যয় করা অথবা তা দ্বারা শিক্ষকদের বেতন দেয়া যাবে কিনা?

(খ) মাদরাসার দায়িত্বশীলগণ যাকাতের টাকা নিজের কাছে রেখে ছাত্রদের বাজার করে খাওয়ালে যাকাত আদায় হবে কি?

(গ) মুহতামিম সাহেব গরীব হলে আত্মসাতের নিয়ত ছাড়া মাদরাসার উপকারের জন্য যাকাতের টাকা নিজের মালিকানায় এনে পরবর্তীতে তা মাদরাসার উন্নয়ন খাতে বা শিক্ষকদের বেতন খাতে খরচ করতে পারবে কিনা?

উত্তর : (ক) যাকাতের টাকা মাদরাসার উন্নয়নের কাজে ব্যয় করা যাবে না এবং এর দ্বারা শিক্ষকদের বেতনও দেয়া যাবে না। কেননা যাকাত আদায় হওয়ার জন্য তামলীকে ফকীর তথা বিনিময়হীনভাবে কোন গরীবকে মালিক বানানো শর্ত। আর উক্ত দুই খাতে তা পাওয়া যায় না। তবে শরীয়তসম্মত তামলীকের মাধ্যমে যাকাতের টাকা উক্ত দুই খাতে ব্যয় করা জায়েয। শরীয়তসম্মত তামলীকের পদ্ধতি বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরামের নিকট থেকে সরাসরি জেনে নেয়া যেতে পারে। (ফাতাওয়া শামী ২/২৭১, ৩৪৩, ৩৪৪, আল-হিদায়া শরহু বিদায়াতিল মুবতাদী ১/১৮৫, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৬/২০১, ২০৮)

(খ) হ্যাঁ, দায়িত্বশীলগণ যাকাতের টাকা নিজেদের কাছে রেখে ঐ পরিমাণ টাকার বাজার করে ছাত্রদের খাওয়ালে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কেননা প্রচলনগতভাবে দায়িত্বশীলগণ যাকাতের টাকা উসূল করার ক্ষেত্রে মাদরাসার গরীব ও ইয়াতীম ছাত্রদের পক্ষ থেকে উকীলের পর্যায়ে, আর ছাত্ররা মুয়াক্কিলের পর্যায়ে। সুতরাং দাতাদের কাছ থেকে যাকাত হস্তগত করার দ্বারাই যাকাতদাতার যাকাত আদায় হয়ে যাবে এবং গরীব ছাত্ররা তার মালিক হয়ে যাবে। তাই যাকাত আদায় হওয়ার জন্য গরীব ছাত্রদেরকে খাওয়ানোর পূর্বে পুনরায় উক্ত টাকার মালিক বানানোর কোন প্রয়োজন নেই; গরীব ছাত্রদের প্রয়োজনে ব্যয় করলেই হবে। (আল-মুহীতুল বুরহানী ফিল-ফিকহিন নু'মানী ৭/২০৪, জাওয়াহিরুল ফিকহ ৩/৩২০)

(গ) যে সকল মাদরাসার মুহতামিমগণ যাকাত উসূল করে থাকেন, তারা মাদরাসার গরীব ছাত্রদের পক্ষ থেকে উকীল। তাই তারা গরীব হওয়া সত্ত্বেও যাকাতের টাকা নিজের মালিকানায় এনে ব্যবহার করতে পারবে না। কেননা যাকাতদাতারা দান করে প্রতিষ্ঠানের গরীব ছাত্রদের জন্য। এজন্য তার মালিক গরীব ছাত্ররাই; মুহতামিম সাহেবের মালিক হওয়ার সুযোগ নেই। (জাওয়াহিরুল ফিকহ ৩/৩২১)

ইঞ্জিনিয়ার শফীকুল ইসলাম
জাপান গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

৩২২ প্রশ্ন : আমি সৌদিআরবে ৩ বছর (২০০৫ থেকে ২০০৮ সন) ছিলাম। সে সময় দশ/বারো বার উমরা করেছি। অধিকাংশ উমরায় হালাল হওয়ার সময় মাথার সামনে, পিছনে দুই পাশের কিছু চুল কেটে হালাল হয়েছি, যা মাথার চারভাগের একভাগের চেয়ে কম হবে। সৌদিআরবের বেশিরভাগ লোক এই নিয়মেই হালাল হয়। এ বিষয়ে

মাসাআলা কী এবং আমার এখন করণীয় কী?

উত্তর : পুরুষের জন্য ইহরাম শেষে হালাল হওয়ার সুন্নাত পদ্ধতি হলো, সম্পূর্ণ মাথা হলক করে (মুণ্ডিয়ে) ফেলা। তবে কেউ চাইলে হলক না করে তাকসীর (চুল ছোট) করার পদ্ধতিও গ্রহণ করতে পারে। তাকসীরের ক্ষেত্রে কর্তব্য হলো, পুরো মাথা থেকে এক ইঞ্চি (সতর্কতামূলক তার চেয়ে কিছু বেশি) পরিমাণ চুল ছোট করে ফেলা। পুরো মাথার চুল ছোট না করে কমপক্ষে মাথার এক চতুর্থাংশ থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ (সতর্কতামূলক তার চেয়ে কিছুটা বেশি) ছোট করলে উমরা থেকে তো হালাল হয়ে যাবে; কিন্তু তার জন্য এমন করাটা মাকরূহ হবে।

আর যদি কেউ মাথার এক চতুর্থাংশের চেয়ে কম স্থানের চুল ছোট করে বা ছোট করা চুলের পরিমাণ এক ইঞ্চির চেয়ে কম হয় তাহলে এভাবে তাকসীরের মাধ্যমে সে ব্যক্তি উমরার ইহরাম থেকে হালাল হবে না। সৌদিআরবের লোকেরা এমন করে থাকলেও এ পদ্ধতিকে সে দেশের গ্রহণযোগ্য আলেমগণও সমর্থন করেন না; বরং এর বিপরীত ফতওয়াই প্রদান করেন। সুতরাং এভাবে এদিক সেদিক থেকে সামান্য কিছু চুল কেটে হালাল হওয়ার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ মনগড়া ও হালাল হওয়ার নামে ছেলেখেলা।

প্রশ্নের বর্ণনানুযায়ী আপনি যেসব উমরায় এক চতুর্থাংশের কম চুল কর্তন করেছেন সেগুলোতে স্বাভাবিকভাবে আপনি হালাল হননি। সুতরাং দেখতে হবে যে, উমরা থেকে ফেরার পর আপনি কোন কারণে নিজ মাথা মুণ্ডন করেছেন কিনা বা চুল কাটার প্রয়োজনে পুরো মাথা বা এক চতুর্থাংশ থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ চুল কেটেছেন কিনা? নিয়ত ছাড়া নিছক অভ্যাসবশতও এমনটি করে থাকলে এরপর থেকে আপনি হালাল।

এখন উমরা থেকে ফিরে আসার পর পুরো মাথার চুল ছেটে হালাল হওয়া পর্যন্ত আপনি ইহরাম পরিপন্থী যেসব কাজ করেছেন, সেগুলোর ব্যাপারে হুকুম হলো, যেহেতু আপনি হালাল হয়ে গিয়েছেন ধারণা করে এ সকল কাজ করেছেন সেজন্য প্রত্যেক উমরার পর ইহরাম পরিপন্থী যে সকল কাজ করেছেন সবগুলোর কারণে একটি করে দম ওয়াজিব হবে।

অতএব এখন আপনার করণীয় হলো, যেসব উমরায় হালাল হওয়ার সময় আপনি আপনার বর্ণিত পদ্ধতিতে চুল কেটেছেন, সেগুলোর প্রত্যেকটির জন্য (দম স্বরূপ) একটি করে ছাগল/ভেড়া/দুম্বা নিজে অথবা কারো মাধ্যমে হারামের এলাকায় জবাই করে দেয়া এবং তার গোশত গরীবদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া। কারণ শাস্তিমূলক দমের পশুর গোশত খাওয়া ধনীদের জন্য বৈধ নয়। (আল-মুহীতুল বুরহানী ফিল-ফিকহিন নু'মানী ২/৪৭৫, আল-বিনায়া শরহুল হিদায়া ৪/২৪৭, আল-ইনায়া শরহুল হিদায়া ২/৪৯০, বাদায়িউস সানায়ে' ২/১৪১, ফাতাওয়া শামী ২/৫৮৭, ৫৯০, ফাতাওয়া লাজনাতুত দায়িমা ১১/২১৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৫/৪২২, কিতাবুন নাওয়াযিল ৭/৪৪২)

এ কে এম শহীদুল্লাহ
আজিমপুর, ঢাকা

৩২৩ প্রশ্ন : (ক) কোন লেখক জীবিত থাকাবস্থায় তার অনুমতি ব্যতীত তার কিতাব অনুবাদ করার বিধান কী?

(খ) কোন লাইব্রেরীর কিতাব অনুমতি ছাড়া ফটোকপি করে বিক্রি করার বিধান কী?

(গ) কোন লাইব্রেরীর কিতাব অনুমতি ছাড়া পিডিএফ করে ইন্টারনেটে ছেড়ে দেয়া কি বৈধ হবে? পিডিএফ থেকে ডাউনলোড করে কিতাব আকারে ছাপানো কি জায়েয হবে?

উত্তর : (ক) কোন কিতাব অনুবাদ করার ক্ষেত্রে ঐ কিতাবের মূল লেখক যদি জীবিত থাকে, তাহলে তার অনুমতি নিয়ে অনুবাদের কাজ শুরু করতে হবে। যাতে কাজের মধ্যে বরকত হয় এবং ব্যাপক ফায়দার ক্ষেত্রে লেখকের কোন পরামর্শ থাকলে সে অনুযায়ী কাজ করা যায়। আর যদি অনুমতি না নিয়েই সঠিকভাবে অনুবাদ করে তাহলে কাজটি অনুচিত হবে; কিন্তু নাজায়েয হবে না।

(খ) কোন কিতাবের লেখক তার লিখিত কিতাবের প্রকাশনার হক কোন প্রকাশনীর কাছে বিক্রি করতে পারবে কিনা এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মাঝে দুই ধরনেরই মত রয়েছে। কিন্তু বর্তমান (ওরফ/প্রচলন) সমাজে যেহেতু এ ধরনের হককে বিনিময়যোগ্য হক ধরা হয়, সেহেতু তার বিক্রি জায়েয হওয়ার উপর ফতওয়া দেয়া হয়। ফলে কোন লাইব্রেরীর কিতাব তার অনুমতি ছাড়া বিক্রয়ের জন্য ছাপা কিংবা ফটোকপি করে বিক্রি করা জালিয়াতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় জায়েয হবে না।

(গ) শুধুমাত্র প্রচারের উদ্দেশ্যে পিডিএফ করে কোন কিতাব অনলাইনে ছেড়ে দেয়ার ক্ষেত্রেও লেখক কিংবা প্রকাশকের অনুমতি নেয়া আবশ্যক। অনুরূপভাবে অনলাইনের পিডিএফ ডাউনলোড করে কিতাবের আকৃতি দিয়ে মার্কেটে ছেড়ে দেয়াও জালিয়াতির অন্তর্ভুক্ত। ফলে তা জায়েয হবে না। তবে শুধু নিজে সংরক্ষণের জন্য ডাউনলোড করে রাখা বা দু-চারজন বন্ধু-বান্ধবের আইডিতে পাঠানো জায়েয আছে। এটা ব্যক্তিগত ব্যবহারের মধ্যে গণ্য হবে। (সুনানে আবূ দাউদ ৩/১৭৭, ফিকহুল বুয়ূ' ১/২৮৬, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৯/২১৯)

মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
দক্ষিণখান, ঢাকা

৩২৪ প্রশ্ন : (ক) আমার কাছে দীর্ঘ দশ থেকে বারো বছর বরং তারও বেশি সময় যাবত পাঁচ-সাত ভরিরও বেশি স্বর্ণ রয়েছে; যার মূল্য যাকাতের নেসাবেরও বেশি হবে। কিন্তু আমার কাছে তেমন কোন নগদ টাকা থাকে না। মাঝে-মধ্যে কিছু টাকা হাতে আসে, আবার তা খরচ হয়ে যায়। এখন জানার বিষয় হলো, এই স্বর্ণগুলোর যাকাত ওয়াজিব হবে কিনা? হলে আমি তা কিভাবে আদায় করবো? বিগত বছরগুলোর যাকাত আদায় করার ক্ষেত্রে কোন সময়ের মূল্য ধরে তা আদায় করতে হবে?

(খ) জনৈক মহিলার কাছে শুধু স্বর্ণ আছে, যা মূল্যের দিক দিয়ে রৌপ্যের নেসাব পরিমাণ হয়। কিন্তু তার কাছে নগদ কোন টাকা নেই। এখন তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কিনা? হলে সে কিভাবে তা আদায় করবে? তা আদায় করার জন্য কি ঋণ করা জরুরী?

(গ) কোন কোন মহিলা এমন আছে, যার স্বর্ণের অলঙ্কার ব্যবহার না করলে হয় না; অলঙ্কার তার ব্যবহার করতেই হয়। এখন প্রশ্ন হলো, এমন মহিলার জন্য স্বর্ণ কি জরুরী জিনিস গণ্য করা যাবে; যাতে করে ঐ ব্যবহৃত স্বর্ণের অলঙ্কারের কারণে তার উপর যাকাত ওয়াজিব না হয়?

(ঘ) সদকায়ে ফিতরের ক্ষেত্রে আমরা তিনটি স্তরের কথা জানি। জানার বিষয় হলো, কার উপর কোন স্তরের সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয়? কোন ব্যক্তি যদি প্রথম স্তরেরটি দিয়ে নিজের সদকায়ে ফিতর আদায় করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তৃতীয় স্তরেরটি দিয়ে আদায় করে তাহলে তার সদকায়ে ফিতর আদায় হবে কি?

উত্তর : (ক) আপনার কাছে নগদ কোন টাকা না থাকলেও যে পরিমাণ স্বর্ণের কথা উল্লেখ করেছেন এ পরিমাণ স্বর্ণ কারো মালিকানায় থাকলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হয়ে যায়। সুতরাং আপনার উপর যাকাত ওয়াজিব। যদি নগদ অর্থ না থাকে তাহলে স্বর্ণ বিক্রয় করে হলেও তা আদায় করা জরুরী।

বিগত বছরগুলোর যাকাতও হিসাব করে আদায় করা জরুরী। যত দ্রুত সম্ভব তা আদায় করা কর্তব্য। দীনের ব্যাপারে এতটা অজ্ঞতা দুঃখজনক।

আর যখন যাকাত আদায় করবেন সে সময়ের বাজার মূল্য ধরে বিগত বছরগুলোরও যাকাত আদায় করবেন।

আপনি আপনার স্বর্ণের যাকাত এভাবে বের করবেন যে, স্বর্ণের বর্তমান বাজারমূল্য হিসাব করে বিগত বছরগুলোর জন্য চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হিসাবে যে পরিমাণ টাকা আসে সে পরিমাণ টাকা যাকাত হিসেবে আদায় করে দিবেন। (কিতাবুল আসল লিশ-শাইবানী ২/৯৩, বাদায়িউস সানায়ে' ২/১৮, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/১৪৩, ১৫৫, ফাতাওয়া উসমানী ২/৫০)

(খ) শুধু স্বর্ণ হলে সাড়ে সাত ভরির কমে নেসাব পূর্ণ হয় না। সুতরাং বাস্তবেই যদি তার কাছে কোন নগদ টাকা না থাকে তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। আর যদি অল্প কিছু টাকাও থেকে থাকে তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে। (বাদায়িউস সানায়ে' ২/৪১০, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/১৭৮)

(গ) স্বর্ণ-রৌপ্য সর্বাবস্থায় যাকাতযোগ্য সম্পদ। চাই তা যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, ব্যবহার করুক বা না করুক, তা যদি নেসাব পরিমাণ হয় এবং এক বছর পুরো অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২৩৫, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/১৫৪-১৫৫, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হাদীস ১০২৬৩, ১০২৭০, ফাতাওয়া উসমানী ২/৬০)

(ঘ) সদকায়ে ফিতর আদায় করার ক্ষেত্রে মূল হলো গম, খেজুর অথবা যব দ্বারা তা আদায় করা। তা যে স্তরেরই হোক না কেন। এগুলোর কোন একটি দ্বারা আদায় করলে সদকায়ে ফিতর আদায় হয়ে যাবে। আর মূল্য দ্বারা যদি আদায় করা হয়, যেমনটি সাধারণত করা হয়, তাহলে সেগুলোর কোন একটির মূল্য যত আসে তা আদায় করলেই আদায় হয়ে যাবে।

কেউ যদি সামর্থ্যবান হয় তাহলে সে উন্নতমানের খেজুর, কিশমিশ বা যবের মূল্য দ্বারাও আদায় করতে পারে; বরং এটিই তার জন্য উত্তম।

ঢালাওভাবে শুধু তৃতীয় স্তরের মূল্য দ্বারা আদায় করা কাম্য নয়। বরং যাদের সামর্থ্য আছে তাদের জন্য উচিত সামর্থ্য অনুযায়ী উত্তম থেকে উত্তম বস্তু দ্বারা তা আদায় করা। (আল-মাবসূত লিস-সারাখসী ৩/১০১, ফাতাওয়া শামী ২/৩৬৬, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২৫৩, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/১৯৬)

মুহাম্মাদ মোশাররফ হোসেন
মেট্রো হাউজিং, বসিলা, ঢাকা

৩২৫ প্রশ্ন : সরকারী বিভিন্ন কাজ যেগুলো ঠিকাদারীর মাধ্যমে করানো হয়, সেগুলোতে নির্ধারিত অর্থের বিভিন্ন পার্সেন্টিজ উদাহরণত ৫% বা ১০% অর্থ সরকারী কর্মকর্তাদেরকে ঘুষ হিসেবে পরিশোধ করতে হয়। আর যদি এমনটি না করা হয়, তাহলে তারা কাজের মঞ্জুরীই দিবে না। উক্ত ঘুষ পরিশোধের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কি?

উত্তর : ঘুষ নেয়া সর্বাবস্থায় হারাম ও কবীরা গুনাহ। আর সাধারণ অবস্থায় ঘুষ দেয়াও হারাম এবং কবীরা গুনাহ। তবে জান, মাল ও ইজ্জতের উপর থেকে যুলুম দূরীভূত করার জন্য অপারগ হয়ে ঘুষ দেয়ার অবকাশ রয়েছে। এক্ষেত্রে ঘুষদাতা গুনাহগার হবে না, তবে ঘুষগ্রহীতা সর্বাবস্থায় গুনাহগার হবে। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৩৫৮০, ফাতাওয়া শামী ৫/৩৬২, আল-বাহরুর রায়িক ৬/২৮৫, ফাতহুল কাদীর ৮/৪০৮, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৬/২৭৩)

মা'হাদ প্রকাশনী
সমৃদ্ধ আগামীর পথে
মা'হাদ প্রকাশনী
معهد بروكاشني للطباعة والنشر والتوزيع
MAHAD PROKASHONI

তারাবীহ নামাযের রাক'আত সংখ্যা
দলীল-প্রমাণ আপত্তি পর্যালোচনা

মুফতী হাফিজুর রহমান

যা আছে এ গ্রন্থে

বের হয়েছে! বের হয়েছে!!

২০ রাক'আত তারাবীহ বিষয়ক দলীল-প্রমাণ
তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ কি একই নামায?
কিয়ামুল লাইলের রাক'আত সংখ্যা কি সুনির্দিষ্ট?
তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ বিষয়ে আল্লামা কাশ্মিরী রহ. এর বক্তব্য ও পর্যালোচনা
তারাবীহ নামাযের রাক'আত সংখ্যা বিষয়ে আল্লামা কাশ্মিরী রহ. এর অভিমত
তারাবীহ নামায আদায়ে ইমাম বুখারী রহ. এর কর্মপন্থা
আহলে হাদীস উলামায়ে কেরামের নিকট তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ নামাযের ব্যবধান
তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ এক নামায হলে তারাবীহ নামায আট রাক'আত কেন?
সুনানে আবূ দাউদে ২০ রাক'আত তারাবীহ বিষয়ক বর্ণনা আছে কি নেই?
৮ রাক'আত তারাবীহ সংক্রান্ত দলীল বিষয়ে মুহতারাম মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবের ৬টি বক্তব্য ও পর্যালোচনা
২০ রাক'আত তারাবীহ সংক্রান্ত দলীল বিষয়ে মুহতারাম মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবের ২৪টি আপত্তি ও পর্যালোচনা

প্রাপ্তিস্থান | মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া, বসিলা গার্ডেন সিটি, ০১৭৯৬৭৩৪২৯৬, ০১৭৪২০৫০২০৬। রাহমানিয়া লাইব্রেরী, ৬৫ সাতমসজিদ সুপার মার্কেট, মুহাম্মাদপুর, ০১৬১৬৮৮২৪০৯। আবাহন, এন/১৪ নূরজাহান রোড, মুহাম্মাদপুর, ০১৬৭৮০২৫২৬০। পার্টি হাউজ কলোনি জামে মসজিদ, আজিমপুর, ০১৮১১২২৮৯৯২। বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ০১৯২২১০৬৬২০।